অষ্টম অধ্যায়
শিল্প

পটভূমিকা

এ জেলার শিল্পের একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে । দীর্ঘসময় এ জেলা ছিল রাজনৈতিক (মতার কেন্দ্রবিন্দু। কর্ণসুবর্ণ, মহীপাল , মুর্শিদাবাদকে ঘিরে রাজনৈতিক (মতার উত্থান পতন এ জেলার শিল্পচর্চাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। মাঝে কিছুদিনের জন্য (মতার কেন্দ্রবিন্দু এ জেলা থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত হলেও ভৌগোলিক দিক থেকে গৌড় জেলাঞ্চল থেকে খুব দূরে নয়। রাজনৈতিক (মতার উত্থান পতন কখনো মুর্শিদাবাদের নগরায়ণ দ্রুততর করেছে , কখনো এসেছে অবনগরায়ণের ধাক্কা । তথাপি অবস্থানগত সুযোগ সুবিধার কারণে মুর্শিদাবাদের শিল্প ও শিল্পীরা মোটামুটিভাবে নিজেদের একটা মান বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

শশাঙ্কের আমল থেকেই মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা পেয়ে এসেছেন বিস্তৃত বাণিজ্যপথের সুবিধা । স্থলপথের বিকাশ না ঘটলেও জলপথের প্রাচুর্য এখানকার শিল্পদ্রব্য রপ্তানীতে যে সহায়তা করেছে তা অন্য অনেক অঞ্চলের ভাগ্যেই জোটেনি। সুলভ শ্রমিক, কাঁচামালের প্রাচুর্য সর্বোপরি বিস্তৃত বাণিজ্যপথ ও বন্দরের সুবিধা মুর্শিদাবাদে শিল্পের এক অনুকূল পরিবেশ তৈরী করেছিল। দীর্ঘসময় জেলার কোথাও না কোথাও রাজনৈতিক (মতার কেন্দ্র থাকাতে বাইরে থেকে বহু অভিজাত মানুষ নানা সময়ে জেলায় এসেছেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাও জেলার শিল্পচর্চাকে গতি দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শু(তেই বাংলা সুবার দেওয়ানখানা ও পরবর্তীকালে রাজধানী, মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর মুর্শিদাবাদের শিল্পচর্চায় যে রক্ত(স্রোত সঞ্চালন করে পরবর্তী প্রায় একশ বছর তা বজায় ছিল । রাজধানী স্থানান্তরের আগেও বন্দর হিসাবে কাশিমবাজারের উত্থান ও সেইসূত্রে বিদেশী বণিকদের আগমন, উত্তরভারতের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ জেলাঞ্চলের শিল্পসম্ভারকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছিল। রাজধানী স্থানান্তর সেই প্রক্রি(য়াকেই আরো দ্রুততর করে। তবে সে গৌরব মোটামুটি ১০০ বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি । ইউরোপের শিল্পবিপ-ব শ্রমনির্ভর দেশীয় শিল্পকে কোণঠাসা করে ফেলে। শৈল্পিক উৎকর্ষের চেয়ে গু(ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দাম। নান্দনিক গু(ত্বের চেয়ে নগদ কাঞ্চনমূল্য বড় হয়ে ওঠা দেশীয় শিল্পের সর্বনাশ করে। জেলাঞ্চলের অবনগরায়ণের ধাক্কায় অভিজাত ব্যক্তি(বর্গের অবস্থার অবনতিও জেলার শিল্পচর্চাকে চরম আঘাত হানে । ইংরেজদের উত্থানে কিছু দেশীয় লোকের হাতে কাঁচা পয়সা এলেও তাঁরা মূলত ছিলেন বেনিয়া প্রকৃতির । শিল্পের নান্দনিক গু(ত্ব উপলব্ধি করা বা তার পৃষ্ঠপোষকতা করা তাদের কাছে ছিল অপ্রয়োজনীয় । অবশ্য এর ব্যতিক্র(ম যে ছিল না তা নয় তবে ব্যতিক্র(ম সাধারণ নিয়মকেই প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জেলার শিল্প মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। আরো পরবর্তীতে যন্ত্রনির্ভর শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শ্রমনির্ভর শিল্পদ্রব্য পদে পদে পর্যুদস্ত হয় ও দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়। তবু আজো কিছু শিল্পী বংশানুক্র(মিক ভাবে সেই সব শিল্পের ধারা কোনমতে টিকিয়ে রেখেছেন। এখনও আশার আলো বলতে সেটুকুই ।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ২৬ টি ব্লক / পঞ্চায়েত সমিতি ও ৭টি পৌরসভা আছে। এই জেলার বহরমপুর শহরে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটি বয়নশিল্প শি(ার কলেজ, একটি পলিটেকনিক ও একটি শিল্প প্রশি(ণ কেন্দ্র আছে। কুটীর ও (দ্র শিল্পের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রায় সবই এই জেলায় বিদ্যমান। নদীপথ, রেলপথ ও সড়কপথের সুবন্দোবস্ত থাকায় ও ফরাক্কায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সুবিধা থাকায় অদূর ভবিষ্যতে এখানে আরো কিছু মাঝারি ও (দ্র শিল্প গড়ে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

শতাব্দীর পুরনো হাতির দাঁতের কাজ সরকারী নিষেধাজ্ঞায় অবলুপ্ত , ফলে হস্তশিল্পীরা চন্দন কাঠের খোদাই শিল্পে আর শোলা শিল্পে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়েছেন। চন্দন কাঠের হস্তশিল্পীরা বহরমপুরের খাগড়া, জিয়াগঞ্জ এলাকায় অবস্থান করেছেন। এই জেলার আর একটি দীর্ঘদিনের পুরোনো হস্তশিল্প 'বালাপোষ' প্রায় অবলুপ্তির পথে।এই সমস্ত দ(শিল্পীরা তাঁদের দ(তার বহু নিদর্শন রেখেছেন। তাঁরা বেশ কয়েকবার রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছেন।এই জেলার অধিকাংশ শিল্পই কৃষিভিত্তিক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চালকল ও হিমঘর।

এই জেলায় এ পর্যন্ত মোট ২৮০৭টি (দ্রশিল্প সংস্থাকে স্থায়ী নিবন্ধীকরণের আওতায় আনা হয়েছে। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে ১২৭৮৮ জনের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে। বলাবাহুল্য এই তালিকার বাইরেও রয়েছে বহু (দ্রশিল্প যেগুলি নিবন্ধীকৃত হয় নি। এ ছাড়াও ব্যক্তি(গত চেষ্টায় কিছু (দ্র ও কুটীর শিল্প গড়ে উঠেছে যার মাধ্যমে আরও বেশ কিছু কর্মসংস্থান হয়েছে। এই জেলার বিভিন্ন ব্লকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা (দ্র ও কুটীর শিল্পের পরিসংখ্যানগত তথ্য সারণী-৮.১ এ দেওয়া হ'ল।

সারণী- ৮.১
ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্প ঃ উৎপাদনের দীর্ঘকালীন ধারা

শিল্প	১৯৯০		১৯৯৫		২০০০	
	উৎপাদনের পরিমাণ	মূল্য (ল(টাকায়)	উৎপাদনের পরিমাণ	মূল্য (ল(টাকায়)	উৎপাদনের পরিমাণ	মূল্য (ল(টাকায়)
হাতির দাঁতের কাজ		বর্তমানে	কোন কাজ করা	যায় না	বা হয় না	
বেল মেটাল	২০০০ মে. টন	৩৬০.০০	২৫০০ মে. টন	৫০০.০০	২৭০০ মে. টন	৬৭৫.০০
রেশম বস্ত্র বয়ন শিল্প	৫ ল(টি	১৫০০.০০	৮ ল(টি	২৪০০.০০	১০ ল(টি	৪০০০.০০
সুতিবস্ত্র তৈরী শিল্প	৬ ল(টি	২০০.০০	৭ ল(টি	৩০০.০০	৭.৫ ল(টি	৩৭৫.০০
মাদুর শিল্প	৫০,০০০ টি	১৮.০০	৫০.০০০ টি	২০.০০	৬০০০০ টি	৩০.০০
শঙ্খ শিল্প	৭০,০০০ টি	৭০.০০	৮০.০০০ টি	১০০.০০	৮০.০০০ টি	১২০,০০
পাঠ শিল্প	৫০,০০০ টি	৪০.০০	১০০০০০ টি	১০০.০০	১৫০০০০ টি	২২৫.০০
বাঁশ বেত শিল্প	১,০০,০০০ টি	১৫.০০	১২০০০০০ টি	২০.০০	১৫০০০০ টি	৩০.০০
চন্দন কাঠ শিল্প	৫,০০০ টি	১০.০০	৬০০০ টি	১৫.০০	৮০০০ টি	২৪.০০
পিতল কাঁসা শিল্প	৮০,০০০ টি	৯০.০০	১২০০০০ টি	১৬০.০০	১৫০০০০ টি	২২৫.০০
তাঁত শিল্প	৫ ল(টি	৫০০.০০	৫ ল(টি	৬০০.০০	৬ ল(টি	৯০০.০০
লা(া শিল্প	১০০ মে. টন	৮০.০০	১০০ মে. টন	৯০.০০	১১৭ মে. টন	১১৭.০০
মৃৎ শিল্প	৮ ল(৭ টি	৬৫.০০	৯ ল(	৮০.০০	৬ ল(টি	৯০.০০
অলঙ্কার শিল্প	৬, ০০০ কিগ্রা	১২০.০০	৬০০০ কি. গ্রা	১৫০.০০	৭০০০ কি. গ্রা.	২০০.০০
রেশমগুটি থেকে রেশম তৈরী শিল্প	১০,০০০ কি. গ্রা	২৫.০০	১২০০০ কি. গ্রা	৩৬.০০	১৫০০০ কি.গ্রা	৫২.৫০
শোলা শিল্প	১০,০০০ টি	১.০০	২০,০০০ টি	৩.০০	২৪০০০ টি	৪.০০
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২০০ মে. টন	২৮০.০০	৩০০ মে. টন	৪৮০.০০	৪০০ মে. টন	৬০০.০০
পাট কাঠির বোর্ড	—				৩,০০,০০০ টি	৫২.০০
ভোজ্য তেল মিল ও আটা মিল	৫,০০০ মে. টন	১৫০০.০০	১০,০০০ মে. টন	৩৫০.০০	২০,০০০ মে. টন	৮০০০.০০
ইঁট ভাটা	৮০০ ল(	১২৮০.০০	৯০০ মে. টন	১৭০০.০০	৯০০ ল(টি	১৮০০.০০
প্লাস্টিক ও রাসায়নিক শিল্প			১০০ মে. টন	৫০.০০	৪০০ মে. টন	৩১৫.০০
বিড়ি শিল্প	২,০০,০০০ ল(	১৮০.০০	২,০০,০০০ ল(	২০০.০০	২৪০০০০ ল(টি	২৬০.০০
অটোমোবাইল শিল্প	৫০০০ টি	২০০.০০	৮০০০ টি	৪০০.০০	১০.০০০ টি	৬০০.০০
আধুনিক চালকল শিল্প	২০,০০০ মে. টন	১০০০.০০	৩০,০০০ মে. টন	১৮০০.০০	৪৩২০০ মে. টন	৩৪৫৬.০০
হোটেল রেঁস্তোরা শিল্প		৫০০.০০		৬০০.০০		৭৫০.০০
ফলরস ও জ্যাম জেলী তৈরী শিল্প	১০০ মে. টন	৩০.০০	১০০ মে. টন	৩৫.০০	১৫০ মে. টন	৬০.০০
চামড়া শিল্প	১ ল(টি	১৫০.০০	২ ল(টি	৪০০.০০	৩ ল(টি	৭০০.০০

শিল্প	১৯৯০		১৯৯৫		২০০০	
	উৎপাদনের পরিমাণ	মূল্য (ল(টাকায়)	উৎপাদনের পরিমাণ	মূল্য (ল(টাকায়)	উৎপাদনের পরিমাণ	মূল্য (ল(টাকায়)
পাট শিল্প	২ ল(	১৫০০.০০	৩ ল(টি	৩০০০.০০	৩ ল(	৩৩০০.০০
ধূমহীন কয়লা তৈরী	১৫০০ মে. টন	১২০.০০	১৮০০ মে. টন	১৫০.০০	১৮০০ মে. টন	১৮০.০০
আধুনিক লেখনী শিল্প					৩৬০০০০ ঘঃ কু	১৮০০০.০০
প্লাইউড ও কাঠ শিল্প	১০০ মে. টন	৮.০০	১৫০ মে. টন	১২.০০	২০০ মে. টন	২০.০০
সাবান শিল্প	১০০ মে. টন	১৮.০০	২০০ মে. টন	২০.০০		
গুড়ো সাবান শিল্প	৫০০ মে. টন	৩৫.০০	৫০০ মে. টন	৪০.০০	১০০০ মে. টন	১০০.০০
মৌমাছি পালন শিল্প	৮০ মে. টন	২৫.০০	১২০ মে. টন	৪০.০০	১৫০ মে. টন	৬০.০০
দড়ি তৈরী শিল্প	৯০ মে. টন	৮.০০	১০০ মে. টন	১০.০০	১২০ মে. টন	১৩.০০
প্লাস্টিক খেলনা ও তৈজসপত্র তৈরী শিল্প	১২০০০০ টি	২০০.০০	৩০,০০০,০০ টি	৬০০.০০	৫২০০০০ টি	১৩০০.০০
পাম্প সেট ও ডিজেল ইঞ্জিন মেরামতি শিল্প	৩০,০০০ টি	২০.০০	৪০,০০০ টি	২৭.০০	৪৫০০০ টি	৩৫.০০
লজেন্স, চানাচুর তৈরী শিল্প	২০,০০০ মে. টন	৬০০০.০০	৩০,০০০ মে. টন	১২০০.০০	৪৫০০০ টি	২২৫০.০০
আইস ক্যান্ডি তৈরী শিল্প	৩০০ ল(টি	২০.০০	৪০০ ল(টি	৩০.০০	৬০০ ল(টি	৬০.০০
গ্রামীণ পাউ(টি শিল্প	২০,০০০ মে. টন	২০০০.০০	২৫০০০ মে. টন	৩০০০.০০	৩০,০০০ মে. টন	৪৫০০.০০

সূত্রঃ সাধারণ প্রবন্ধক, জেলা শিল্পকেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ

সারণী ৮.২

বিভিন্ন ((ত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার (একক হাজার কিলোওয়াট/ঘন্টা)

((ত্র	১৯৭৭-৭৮	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-১৯৯১	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-২০০০
বাসগৃহ	৬৭৪১.৭	১১৪৫০	২৮৭০৭	৬৬৫৫৯	২৭৫৯২০
বাণিজ্য	৩৮৪২	৮৭২০	১৩৬৩৯	২৫৫৭২	৮১২৫৩
শিল্প	১১৬১৪.৮	১২৫৭৬	১৯০৫২	২৪২২৩	৬৮৫২৯
পাবলিক লাইটিং	৫৪১.৬	৫৯০	১৯৮১	১৫৫২	১৬২৭
কৃষি ও সেচ	৭৯০১.৪	১৫৮৫৭	৫৪১৮৮	১৬৪৬৮০	৩৯২৫৩৪
জল সরবরাহ ও জল নির্গমণ	১৮০.৬	৮৬৫	১১২৩	১৪২৯	৯২২
রেল	৫৫.৭				
বিবিধ	৯৩৬৪.৭				
মোট	৪০২৪২.৫	৪৯৮৫৮	১,১৮,০৯০	২,৮৪,০১৫	৮,২০,৭৮৫

সূত্র ঃ বিভিন্ন বছরের স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ড বুক

সারণী-৮.৩
নিবন্ধীকৃত (ুদ্র ও কুটীর শিল্প

ত্র(মিক সংখ্যা	শিল্পের নাম	ব্লক/পঞ্চায়েতসমিতি	শিল্প সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
(১)	হাতির দাঁতের কাজ	বহরমপুর	৫০টি	২০০ জন
(২)	ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	বহরমপুর, বেলডাঙ্গা রঘুনাথগঞ্জ, কান্দী লালগোলা, রাণীনগর-১	১০০টি	৫০০ জন
(৩)	পাটকাঠির বোর্ড	বহরমপুর, জলঙ্গী	৮টি	৩০০ জন
(৪)	বৈদ্যুতিকট্রান্সফর্মার তৈরী শিল্প	বহরমপুর	২টি	২০ জন
(৫)	কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী, ধান-মাড়াই, গম-মাড়াই মেশিন তৈরী	বহরমপুর	১টি	৫ জন
(৬)	আধুনিক চালকল শিল্প	বহরমপুর, কান্দী, রঘুনাথগঞ্জ, বড়এ(া, ভরতপুর-২	৯টি	৪০০ জন
(৭)	হোটেল রেঁস্তোরা শিল্প	বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ, ফরাক্কা, লালবাগ, কান্দী	১০টি	১০০ জন
(৮)	স্যানিটারি যন্ত্রপাতি তৈরী শিল্প	বহরমপুর	১টি	৬ জন
(৯)	বেলমেটাল (কাঁসা)	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ	২৫০টি	৩০০০ জন
(১০)	ফলরস ও জ্যাম-জেলী তৈরী শিল্প	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ	৫টি	৫০ জন
(১১)	স্টীল ট্রাঙ্ক তৈরী	বহরমপুর	৩২টি	২০০ জন
(১২)	ভোজ্যতেল মিল ও আটামিল	বহরমপুর, কান্দী, রঘুনাথগঞ্জ, বেলডাঙ্গা	৩০০টি	১৫০০ জন
(১৩)	পেপার বোর্ড তৈরী	বহরমপুর	১টি	১০ জন(১৪)
(১৪)	ইঁট ভাটা	বহরমপুর, রাণীনগর,	৫০টি	১০,০০০ জন
(১৫)	প-াস্টিক ও রাসায়নিক শিল্প	বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ	১৫টি	১৫০ জন
(১৬)	রেশম বস্ত্র বয়ন শিল্প	রাণীনগর-১, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ রঘুনাথগঞ্জ-১, খড়গ্রাম, নবগ্রাম	৬০০০টি	১২০০০ জন
(১৭)	সুতি বস্ত্র তৈরী শিল্প	ডোমকল, বেলডাঙ্গা, খড়গ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ-২ সামশেরগঞ্জ	১০০টি	৫০০ জন
(১৮)	মাদুর শিল্প	ডোমকল	২০০টি	৬০০ জন
(১৯)	শঙ্খ শিল্প	ডোমকল	৪০০টি	৮০০ জন
(২০)	বিড়ি শিল্প	সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ-১	২০০টি	৪০০০০ জন
(২১)	চামড়া শিল্প	সামশেরগঞ্জ, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর	৫টি	৫০ জন
(২২)	পাট শিল্প	বহরমপুর	৫০টি	২৫০ জন

ত্র(মিক সংখ্যা	শিল্পের নাম	ব্লক / পঞ্চায়েত সমিতি	শিল্প সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
(২৩)	ইলেকট্রনিক্স শিল্প	বহরমপুর, ফরাক্কা, কান্দী	২০টি	১০০ জন
(২৪)	বাঁশ বেত শিল্প	নবগ্রাম, সাগরদীঘি	৫০০টি	৫০০ জন
(২৫)	মুড়ি ভাজা শিল্প	বহরমপুর	১৪টি	৬০ জন
(২৬)	চন্দন কাঠ শিল্প	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ	২০টি	৮০ জন
(২৭)	পিতল কাঁসা শিল্প	বহরমপুর		
(২৮)	তাঁত শিল্প	ডোমকল, বেলডাঙ্গা,	২৫০টি	৫০০ জন
		খড়গ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ-২, লালগোলা	২০০০টি	৪০০০ জন
(২৯)	লা(া শিল্প	সামশেরগঞ্জ	১০টি	৫০ জন
(৩০)	হিমঘর	বহরমপুর, কান্দী, বড়এ(া	৯টি	৪৫০ জন
(৩১)	মোজাইক টালী তৈরী	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	৩টি	৫ জন
(৩২)	ঔষধ তৈরী শিল্প	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর	২টি	৪০ জন
(৩৩)	অটোমোবাইল শিল্প	বহরমপুর, কান্দী,		
		রঘুনাথগঞ্জ-১, বেলডাঙ্গা	৫০টি	৪০০ জন
(৩৪)	ধূমহীন কয়লা তৈরী		২০টি	৮০ জন
(৩৫)	আধুনিক লেখনী শিল্প	বহরমপুর, কান্দী	৫টি	২৫ জন
(৩৬)	প-াইউড ও কাঠমিল	বহরমপুর, কান্দী	১০টি	১৫০ জন
(৩৭)	সাবান শিল্প	বহরমপুর	১টি	৫ জন
(৩৮)	গুঁড়ো সাবান শিল্প	বহরমপুর, লালগোলা	৫টি	৫০ জন
(৩৯)	মৃৎশিল্প	বহরমপুর	২০০টি	৬০০ জন
(৪০)	মৌমাছি পালন শিল্প	রাণীনগর, ফরাক্কা	৫০টি	২০০ জন
(৪১)	দড়ি তৈরী শিল্প	জলঙ্গী	১টি	১০ জন
(৪২)	সূচী শিল্প / এমব্রয়ডারী	ভরতপুর-২, কান্দী, বহরমপুর	১০টি	১০০ জন
(৪৩)	স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যালঙ্কার তৈরী শিল্প	বহরমপুর, কান্দী, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, রাণীনগর-১, ডোমকল, বেলডাঙ্গা	২২০০টি	৪৪০০ জন
(৪৪)	পাথরভাঙ্গা শিল্প	সামশেরগঞ্জ, সুতি-২	১০টি	১০০ জন
(৪৫)	প-াস্টিক খেলনা ও তৈজসপত্র তৈরী শিল্প	রঘুনাথগঞ্জ-১	১৪টি	৭০ জন
(৪৬)	হোসিয়ারী শিল্প	বহরমপুর	২টি	২০ জন
(৪৭)	পাম্পসেট এণ্ড ডিজেল মেরামতি শিল্প	বহরমপুর, কান্দী, রঘুনাথগঞ্জ-১	৩০টি	১৫০ জন
(৪৮)	বিস্কুট তৈরী (বেকারী)	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	১টি	১৫ জন
(৪৯)	লজেন্স, চানাচুর তৈরী শিল্প	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ		
		লালগোলা, বহরমপুর	৩০টি	২১০ জন
(৫০)	আইস ক্যান্ডী তৈরী শিল্প	লালগোলা, কান্দী, বহরমপুর	২০টি	১০০ জন

ত্র(মিক সংখ্যা	শিল্পের নাম	ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি	শিল্প সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
(৫১)	স্টীল ও কাঠের আসবাবপত্র তৈরী শিল্প	বহরমপুর	৫০টি	৫০০ জন
(৫২)	গ্রামীণ পাউ(টি তৈরী শিল্প	বহরমপুর, সামশেরগঞ্জ, লালগোলা, কান্দী	৫০টি	৫০০ জন
(৫৩)	রেশম গুটি থেকে রেশম তৈরী শিল্প	রঘুনাথগঞ্জ, রাণীনগর, নবগ্রাম	৫০টি	৫০০ জন
(৫৪)	রেশম সুতো পাকানো শিল্প	রঘুনাথগঞ্জ, রাণীনগর, নবগ্রাম	৫০টি	২৫০ জন
(৫৫)	রেশম কাপড়ের থান তৈরী শিল্প	রঘুনাথগঞ্জ-১, রাণীনগর-১	৫০টি	২০০ জন
(৫৬)	গোখাদ্য তৈরী শিল্প	বহরমপুর	১টি	১০ জন
(৫৭)	দুধ থেকে ছানা তৈরী শিল্প	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	১টি	৫ জন
(৫৮)	উল নিটিং শিল্প	রঘুনাথগঞ্জ, ভরতপুর-২, কান্দী, বহরমপুর	৪০টি	২০০ জন
(৫৯)	টায়ার রি-সোলিং শিল্প	বহরমপুর	১টি	৫ জন
(৬০)	শোলা শিল্প	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ	২০টি	৮০ জন
(৬১)	পরিশ্রুত জল তৈরী শিল্প	বহরমপুর, রঘুনাথগঞ্জ	৩টি	১৫ জন
(৬২)	পানীয় জল	বেলডাঙ্গা	২টি	৫ জন
(৬৩)	পাটজাত শিল্প দ্রব্যাদি	বহরমপুর, লালবাগ, রাণীনগর-১	৫টি	১০ জন

সূত্র ঃ সাধারণ প্রবন্ধক, জেলা শিল্পকেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ

সারণী - ৮.৪

জেলা শিল্প কেন্দ্র কতৃক বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ ঋণ ও অনুদাণ।

বৎসর	প্রকল্পের নাম	উপকৃত ব্যক্তি(র সংখ্যা	ঋণ/অনুদানের পরিমাণ
১৯৮০-৮১ থেকে ২০০২ - ০৩	প্রান্তিক ঋণ	৪৮৬	৩৭.৫২ ল(
১৯৮০-৮১ থেকে ২০০২ - ০৩	বি.এস.এ.আই. ঋণ	৫২৭	২৩.৯২ ল(
১৯৮০-৮১ থেকে ২০০২ - ০৩	(দ্র ও কুটীর শিল্পে অনুদান	৫৯১	১২০.৮৫ ল(
১৯৮৬-৮৭ থেকে ২০০২ - ০৩	জৈব গ্যাস আধার স্থাপন	২৪৭২৪	৫৭৮.৯৪ ল(
১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০২ - ০৩	প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা	৩৯৪৫	২০৯০.০৪ ল(

সূত্র ঃ সাধারণ প্রবন্ধক, জেলা শিল্পকেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ

কুটীর শিল্পে বিশেষ করে হস্ত শিল্পে মুর্শিদাবাদ জেলার অবদান উল্লেখযোগ্য। এখানকার বিড়ি শিল্প, মাদুর শিল্প, শঙ্খ শিল্প, চন্দন কাঠ শিল্প, শোলা শিল্প, বালাপোষ শিল্প, পিতল-কাঁসার বাসন সর্বজনবিদিত। জেলার কা(ও হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান উৎকর্ষের জন্য বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দ্রব্যের উপর প্রশি(ণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রশি(ণ হয়ে থাকে তিনমাস, ছয়মাস, অথবা এক বৎসরের। জেলার ধুলিয়ানে একটি লা(া প্রশি(ণ কেন্দ্র আছে। যেখান থেকে প্রতি বছর ২০ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং তাদের মাসিক ২৫০ টাকা হারে স্টাইপেন্ডেরও ব্যবস্থা আছে।

হস্ত ও কা(শিল্পীদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করার জন্য জেলা শিল্প কেন্দ্র মঞ্জুষাকে আমন্ত্রণ জানায়, মঞ্জুষা উক্ত(শিল্পীদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করে। এ ছাড়াও জেলা শিল্প কেন্দ্রের মাধ্যমে এই শিল্পীরা বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ ক'রে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি(করে থাকে। যেমন কলিকাতা মেলা, বিদ্যাসাগর মেলা, নেতাজী মেলা ও হাজারদুয়ারী উৎসব, দিল্লী মেলা ইত্যাদি।

রেশমশিল্প, বয়নশিল্প ও খাদিশিল্প

পলু পোকা থেকে রেশম তৈরীর কৌশল চীনারা প্রথম আয়ত্ত করে। খ্রীষ্ট পূর্ব প্রায় ২৬৪০ অব্দে চীন সম্রাজ্ঞী পলু পোকা পোষেন এবং রেশম বোনার তাঁত উদ্ভাবন করেন। পলু পোকা পুষে তার থেকে রেশম তৈরীর রহস্য চীনারা বহু শতাব্দী বাইরের লোকের কাছে গোপন করে রাখে। দেশের বাইরে পলু পোকা কিংবা পলুপোকার ডিম চালান দেওয়া ছিল মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ। কিন্তু কোনকিছুই কোন দেশ চিরকাল নিজের একচেটিয়া সম্পত্তি করে রাখতে পারে না। ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে ভারতবর্ষে পলুপোকা পালন আরম্ভ হয়।

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের সা(্য থেকে বলা যায় ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে রেশমের চল ছিল। কিন্তু পলু পোকাজাত রেশম নয়। বনাঞ্চলে শাল, অর্জুন, আসান, কুল প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে সেসব গাছে একজাতীয় পোকা গুটি তৈরী করত তা থেকে রেশম পাওয়া যেত। তাকে বলে তসর। ভারত থেকে রেশম যায় পারস্যে। আলেকজান্ডারের পারস্য জয়ের ফলে রেশম ইউরোপ পৌঁছায়। আজ থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগে রেশম বোঝাই উটের সারি নিয়ে বণিকের দল চীন থেকে পারস্য ও তুরস্ক হয়ে ইউরোপের পথে লম্বা পাড়ি দিত। ইতিহাসে এই পথটা রেশম সরণী বা সিল্ক (ট নামে প্রসিদ্ধ।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুবর্ণকুড্যর রেশমের প্রশংসা আছে। পণ্ডিতদের মতে সুবর্ণকুড্য রাজা শশাঙ্কের রাজধানী গঙ্গার তীরবর্তী কর্ণসুবর্ণ, প্রাকৃতজনকথিত রাঙামাটি। বাংলার রেশম ও রেশম বস্ত্রের খ্যাতি একদিন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পশ্চিমবাংলায় মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে রেশম চাষ হয়। মুর্শিদাবাদে যে রেশমের থান ও সুদৃশ্য শাড়ি তৈরী হয় তার রেশমের বেশির ভাগ আসে মালদহ থেকে। আজও এই সব জেলায় বহু রেশম কুঠী, বয়লার প্রভৃতির অবশেষ এই সব জেলায় রেশম শিল্পের বিস্তৃতির সা(্য দেয়। কাশিমবাজার সিল্ক একদিন ইউরোপ জয় করেছিল। আজ মুর্শিদাবাদের সে দিন নাই। তবে এখনো এই রেশম দেশের মধ্যে সেরা, সূক্ষ্মতায়, মসৃণতায়, কোমলতায়, মাদ্রাজী কিংবা কাশ্মীরী রেশমবস্ত্র থেকে এর উৎকর্ষ সর্বজন স্বীকৃত।

রকমারি রেশম ঃ রেশম পোকার বৈচিত্র্য অনুযায়ী সাধারণতঃ রেশম চার প্রকার— তুঁত রেশম, তসর, এন্ডি, মুগা।

তুঁত রেশম— যে পলু তুঁত পাতা খেয়ে বৃদ্ধি পায় ও গুটি বাঁধে তার থেকে যে রেশম পাওয়া যায়।

তসর—বন-জঙ্গলে শাল, আসান, অর্জুন প্রভৃতি গাছের পাতা খেয়ে যে পলু পোকা বৃদ্ধি পায় ও গুটি বাঁধে তারই নাম তসর গুটি।

এন্ডি—এন্ডি পলু পোকা সাধারণত এরন্ড বা ভেরেন্ডা গাছের পাতা খেয়ে বাড়ে।

মুগা—মুগা পলু একমাত্র আসামেই পালন করা হয়। সোয়ালো গাছের পাতা খেয়ে বড় হয় ও গুটি বাঁধে। মুগার গুটি কাটাই করে কাঁচা সোনার মতো সুতো পাওয়া যায়।

এছাড়া কৃত্রিম রেশম বলে যা চলে প্রকৃত রেশম থেকে তাকে আলাদা করার জন্য রেয়ন নাম দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত রেশম বলতে লোকে সাধারণত তুঁত রেশমের কথাই মনে করে। উৎপাদনের পদ্ধতি হিসাবে রেশমকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—রিন্ড সিল্ক ও স্পান সিল্ক। তুঁত রেশম ও মটকা একই উপাদানের দুই রূপ। রেশম গুটি থেকে রিলিং পদ্ধতিতে রেশম সুতো নিষ্কাশিত হয়। রেশম গুটি কেটে পোকা বেরিয়ে গেলে গুটির দাম কমে যায়। ফুটন্ত জলে দিয়ে তার থেকে রেশম সুতো বেরোয় না। জলে সিদ্ধ করে শুকিয়ে প্যাডেল চরকায় অর্থাৎ চরকায় সেই কাটা গুটি থেকে ('পিয়ার্স কোকুন' বা লাট) সুতো তৈরী হয়। চরকায় সুতো কাটা হয় বলে এই রেশমকে বলে 'স্পান সিল্ক' বা 'মটকার সুতো'। তার থেকে মটকার কাপড়

রিলিং করার সময় গুটির কিছু অংশ বাদ যায়। সেটাকে বলে ঝুট। এই ঝুটও ফেলা যায় না। তকলিতে বা প্যাডেল চরকায় এই ঝুট থেকে ঝুট সুতো বেরোয় এবং তা দিয়েও কাপড় বোনা হয়। রেশম গুটি থেকে যেমন পোকা বেরিয়ে এসে গুটিটাকে কেটে দেয় তেমনই তসর গুটি থেকেও পোকা বাইরে বেরিয়ে আসে। এই পোকায় কাটা তসর গুটিকে বলে ল্যাথা। এও ফেলা যায় না। নানা কাজে লাগে। ল্যাথা থেকে প্যাডেল চরকায় বা তকলিতে সুতো কেটে কেঠিয়া সুতো তৈরী হয়। এই সুতোর কাপড়কে বলে কেঠে কাপড়।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের চন্দ্রকান্ত ললিত মোহন সমিতি তাদের গবেষণাগারে তসর গুটির ডান্টিকে (বক বা পেডান কল) সোডা প্রভৃতি দিয়ে জলে সিদ্ধ করে পরে পিটিয়ে ফেসো করে তার থেকে সুতো তৈরী করছে, একে নাম দেওয়া হয়েছে বল্কল সুতো। এ থেকে হয় বল্কল বস্ত্র। গরম বলে শীতকালে পরা আরামদায়ক। তসরের টানা আর কেঠো সুতোর ভরণা দিয়ে যে কাপড় তৈরী হয় তাকে বলে তসর কোঠা। রেশম বস্ত্রের রকমারি সম্পর্কে পরে বিশদ ভাবে বলা হয়েছে।

পলুপোকা থেকে রেশমের জন্মকথা ঃ রেশম একটি কৃষিজ জৈব শৈল্পিক বস্তু, ইংরেজীতে বলে agrobio industrial commodity। জমি চাষ ক'রে পলু পোকার খাদ্য তুঁত পাতার যোগান দিতে হয়। কাঁচা রেশম তাঁতে বোনা হয়। এগুলি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে।

পলু পোকা থেকে রেশম তৈরীতে নিচের উপাদানগুলি অবশ্য প্রয়োজন। পলুর ডিম বা বিছন, তুঁত জমি, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পলুঘর। চাই পলুপোকার উপযুক্ত(পরিচর্যা, জীবানুমুক্ত(পরিবেশ, মশা মাছির আত্র(মণ ও রোগ সংত্র(মণ থেকে সর্বদা সতর্কতা।

পলুপোকার ডিম বা বিছন এক রকম নয়। এর অনেকগুলি জাত আছে। নিস্তারি, এফ্ ওয়ান (F1), জয়রেন, বাইভোল্ট (জাপানী), এন টু জি (N2G) প্রভৃতি। পশ্চিমবাংলায় নিস্তারি ও এফ্ওয়ান বেশি প্রচলিত। নিস্তারি এদেশের বহু পুরাতন জাত। বিদেশী ও দেশী পোকার সংমিশ্রণে এফ্ওয়ানের সৃষ্টি সাম্প্রতিককালে। পলুপোকা পালনকারী বা কানী সাধারণত বহরমপুরে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সেরিকালচার প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮ গ্রাম ওজনের একশ পলুপোকা ডিমের প্যাকেট কিনে আনে। ডিমগুলি পোস্ত দানার মত স(। ডিমগুলিকে এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটা নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় বিশেষভাবে নির্মিত পলুঘরে রাখতে হয়। পলুঘর সর্বদা জীবানুমুক্ত(, মশা-মাছিমুক্ত(, পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। কারণ ডিম ফুটে পলুপোকার জন্ম হলে প্রতিনিয়ত নানা রোগের আশঙ্কা থাকে। প্রথম অবস্থায় পলু পোকাকে কচি তুঁতপাতা জিরি জিরি করে কেটে খেতে দিতে হয়। সাত আটদিন পর পোকা একদিন উপবাস করে। খাওয়া বন্ধ। সে সময় খোলস ছাড়ে, শরীর বাড়ে। একে বলে মাটিয়া বা মেটে কলপ। আবার একদিন উপবাস ও খোলস ছাড়া। এই ভাবে তে-কলপ ও পরে সোদ কলপ বা শেষ কলপ। আবার কয়েকদিন পাতা খেয়ে শেষে খাওয়া আস্তে আস্তে কমে যায় ও একদম বন্ধ হয়। শরীর আর বাড়ে না। পোকারা তখন নিজের মুখ থেকে লালা বের করে নিজের শরীরের চারিদিকে গুটি পাকায়। বিছন থেকে এইভাবে গুটি তৈরী হতে ত্রিশ বত্রিশ দিন সময় লাগে। রেশমগুটিকে চলতি কথায় বলে রেশম কোয়া। রেশম কোয়ার উৎকর্ষের ওপর রেশমের ভাল মন্দ নির্ভর করে। পলু পোকা সুস্থ সবল হলে কোয়া ভাল হয়। অধিকাংশ বসনীর পশুপালনের জন্য তুঁত চাষের জমি আছে।

রেশমের কোয়ার চারটি বন্দ বা মরশুম। এই সময় রেশমের কারবারীরা বসনীর কাছ থেকে কোয়া সংগ্রহ করে। চারটি বন্দ ১) জেঠা বন্দ, ২) ভাদরিয়া বন্দ বা ভাদ্রমাসের বন্দ, ৩) অগ্রহায়ণী বন্দ বা অঘ্রানী বন্দ, ৪) চৈতী বন্দ বা চৈত্রমাসের বন্দ। বছরে এই চারবার কোয়া তৈরী হয়। রেশম ব্যবসায়ী এ সময় কোয়া কিনে রোদে শুকিয়ে রাখে। কয়েকদিন রোদ দিলে সেই উত্তাপে ভেতরের পোকাটা মারা যায়। চৈতী বন্দের গুটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আর বর্ষার সময়কার গুটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট। রেশম কোয়ার ব্যবসা বহুকাল থেকে বঙ্গদেশের একটি বড় ব্যবসা।

মুর্শিদাবাদ জেলাতে বহুকাল থেকে পলুপোকার চাষ চলে আসছে। সাগরপাড়া, বামনাবাদ, টলটলি, নরসিংহপুর, কুপতলা, চাতরা, নিশ্চিন্তপুর, গড়াইমারী, ঘোড়ামারা, শঙ্করপুর, বেলডাঙ্গা তাছাড়া লালবাগ, ভগবানগোলা, পীরতলা, পাঁচগ্রাম, কিরীটেশ্বরী এবং কান্দী মহকুমার বিশেষভাবে খড়গ্রাম, বড়এ(া অঞ্চলে পলু চাষ হয়।

নিবিড় পর্যবে(ণে একথা পরিস্ফুট হয় যে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রেশম গুটির চাষ হলেও তা মূলত দু'তিনটি ব্লক এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ব্লকগুলি হ'ল রাণীনগর-১, জলঙ্গী, বড়এ(া রাণীনগর-২, ভগবানগোলা-১, , খড়গ্রাম এবং মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ। মূলত পতিত এবং ডাঙ্গা জমিতে তুঁতের চাষ হয়ে থাকে।

সারণী-৮.৫ এর তথ্য থেকে এ জেলার তুঁত জমির পরিমাণ, রেশম উৎপাদন, কর্মী, রেশমতাঁতের সংখ্যা প্রভৃতি জানা যাবে।

সারণী - ৮.৫
জেলায় তুঁত চাষের জমি, রেশম উৎপাদন ও কর্মী সংখ্যা

বৎসর	তাঁত চাষের জমির পরিমাণ (হেক্টর)	পলুপোকাচাষী (বসনী) পরিবার	ডি.এফ.লেইন রিয়ার্ড সংখ্যা (.০০০)	রিলিংযোগ্য রেশম গুটি উৎপাদন(কেজি)	রিলিং বেসিন সংখ্যা	কাঁচা রেশম উৎপাদন(কেজি)	রেশম তাঁত সংখ্যা
১৯৯৫-৯৬	৩১৪১.১৮	১৯৩৯৬	০.৬০০	২০৮১০০০	১৫০০	১৭৩৯৬০	১৫৪০৮
১৯৯৬-৯৭	৩২১৬.০০	১৯৯৩৭	৯.০৯৭	২২৬১৫০০	১৬০০	১৬০০২০	১৫৮০০
১৯৯৭-৯৮	৩০২৮.০০	১৮৬৯৮	৯.০৮৪	২২৭১০০০	১৯০০	১৭৪৬৯২০	১৬০০০

সূত্র ঃ ডেপুটি ডিরেক্টর সেরিকালচার, মুর্শিদাবাদ(ডিষ্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস, 'কী স্ট্যাটিসটিকস্ অব্ দ্য ডিষ্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ ১৯৯৮'

মুর্শিদাবাদের রেশমের অতীত গৌরব ঃ

অতীতে বাংলার সমৃদ্ধ রেশমশিল্পে মুর্শিদাবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুবর্ণকুড্যর উল্লেখ মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্পের প্রাচীনত্বের সা(্য। মোগল আমলে মোগল দরবারের ও মোগল হারেমের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে। সেই সঙ্গে বিদেশী বণিকদের দৃষ্টি এই শিল্পের ওপর পড়ে। এই জেলার কয়েকটি স্থান রেশম শিল্পকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে, বহু বিদেশী বণিক বাণিজ্যের স্বার্থে মুর্শিদাবাদ শহর, কাশিমবাজার, সৈদাবাদ, জঙ্গীপুর এই সকল স্থানে আসেন। এদের মধ্যে কাশিমবাজার ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ওলন্দাজদের কুঠী গড়ে ওঠে কালিকাপুরে (১৬৪৮), ইংরেজদের কাশিমবাজারে (১৬৫৮), ফরাসীদের সৈদাবাদে (১৬৯১)। এছাড়া প্রতিটি বিদেশী বণিক কোম্পানীর কুঠী ছিল কাশিমবাজারে। ইংরেজদের জঙ্গীপুর ও গুনুটিয়াতেও রেশমকুঠী ছিল।

প্রথম যে ইউরোপীয় জাতির চোখে, (পর্তুগীজদের কথা বাদ দিলে) রেশম কেন্দ্র হিসাবে কাশিমবাজারের পরিষ্কার সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছিল, সে জাতি ইংরেজ। ইংরেজ কোম্পানী সুরাট থেকে একদল পর্যবে(ক পাঠিয়েছিল পাটনায় নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার বাজারের অবস্থা খতিয়ে দেখতে। ১৬২১ সালে তাঁরা তাঁদের প্রতিবেদনে মুর্শিদাবাদে বিপুল পরিমাণ রেশম পাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা ৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে কাশিমবাজারে কুঠী স্থাপন করেন। তখন থেকে কাশিমবাজারের শিল্পসম্ভাবনা বাস্তব রূপ নিতে আরম্ভ করে। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ কুঠি স্থাপনের ২৩ বছর পর, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় মোট বিনিয়োগ ২,৩০,০০০ পাউন্ডের মধ্যে একমাত্র কাশিমবাজারেই ১,৪০,০০০ পাউন্ড বিনিয়োগ করে। (এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন্ ট্রানজিশন, মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫-১৭৯৩, খান মহম্মদ মহসীন, পৃঃ-৭)। মালদহে ও কাশিমবাজারে কুঠী স্থাপনার পর কোম্পানীর রেশম ও রেশমী বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় এবং দামে সস্তা ও গুণমানে বেশী উন্নত হওয়ায় ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের মধ্যে রেশমজাত বস্ত্রাদির চলন বাড়ে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী রেশমী বস্ত্র রপ্তানী নিষিদ্ধ করে আইন তৈরী হলেও ইংল্যান্ডে বাংলার, বিশেষতঃ কাশিমবাজারের রেশমী বস্ত্র আমদানী কমেনি। ইংরেজ বণিকেরা ইংল্যান্ড থেকে রেশমীবস্ত্র পুনরায় ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরের অন্যান্য দেশে রপ্তানী করত। বার্নিয়ের (জানুয়ারি, ১৬৬৬), ট্যাভারনিয়ার (ফেব্রুয়ারি, ১৬৬৬), স্ট্রেইনস্যাম্ মাষ্টার (১৬৭৫-১৬৮০) এই সব বিদেশী পর্যটকগণ তাঁদের বিবরণে সপ্তদশ শতকে রেশমবয়ন শিল্পকেন্দ্র হিসাবে কাশিমবাজারের গু(ত্ব উল্লেখ করেন। (Our old silk Industry and Murshidabad by Dr. Kalikinkar Datta (K. N. College centenary commemoration volume page-215) অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জেমস্ রেনেল লেখেন (১৭৭৯ খ্রীঃ) বাংলার রেশমের সাধারণ বাজার হচ্ছে কাশিমবাজার এবং এখানে প্রচুর পরিমাণ রেশমবস্ত্র ও সুতিবস্ত্র উৎপন্ন হয়। এশিয়ার একটা বড়ো অংশে এই বস্ত্র রপ্তানী হয়। ৩,০০,৬০০ থেকে ৪,০০,০০০ পাউন্ড ওজনের কাঁচা রেশম ইউরোপের শিল্প কারখানায় যায়। এই সময় কোম্পানীর ফিলেচার ও অন্যান্য সরঞ্জামের মূল্য ছিল ২০ ল(টাকা। ইংরেজ কোম্পানী জঙ্গীপুরের রেশমকুঠীতে ১৭৭৩ সালে রেশম তৈরীর ফিলেচার স্থাপন করে। ১৮০২ সালে লর্ড ভ্যালেনসিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী, এটি ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সর্ববৃহৎ রেশম কেন্দ্র। এখানে ছিল ৬০০ চুল্লী, কর্মী ছিল ৩০০০ জন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি কোম্পানী এখানে কাজ চালায়। তারপর তাদের একচেটিয়া

বাণিজ্য বন্ধ হয়। অনেক নতুন নতুন ইউরোপীয় ফার্ম কাজে নামে। মেসার্স ওয়াটসন এন্ড কোং এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান রেশম শিল্প কোম্পানী।

অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভের ফলে রেশম তাঁতীদের ওপর ইংরেজ কোম্পানীর দালাল ও গোমস্তাদের নির্যাতন এবং তাদের পাকদার হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করার নীতি এই শিল্পকে ত্র(মশঃ অবনতির পথে নিয়ে গেল যার থেকে এই শিল্পের পুন(জ্জীবন হ'ল অসম্ভব। রেশমবয়ন কেন্দ্র হিসাবে মালদহ ও কাশিমবাজারের গু(ত্ব রইল না। রেশমবস্ত্র রপ্তানীকারক থেকে বাংলাদেশ কাঁচা রেশম রপ্তানীকারক দেশে পরিণত হ'ল।

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ-ব ঘটার ফলে ম্যানচেস্টারের কাপড়ের মিলের জন্য ইংরেজদের দরকার ছিল কাঁচা রেশম। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংল্যান্ডে কাঁচা রেশমের অত্যধিক চাহিদা বাড়ে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রেশমবস্ত্র উৎপাদনের চেয়ে কাঁচা রেশম উৎপাদনে বেশি মনোযোগ দেয়। তারা উৎকৃষ্ট কাঁচা রেশম পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইতালী ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে প্রচলিত ফিলেচার প্রথায় এদেশে উন্নত রেশম তৈরীর জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে একদল বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসে। (মেজর এইচ. টুল. ওয়ালশ, এ হিস্ট্রি অব্ মুর্শিদাবাদ)। ১৭৭৬-১৭৮৫ এর দশকে বঙ্গদেশ থেকে ইংল্যান্ডে কাঁচা রেশমের বার্ষিক গড় রপ্তানী ৫,৬০,০০০ স্মল পাউন্ডের বেশী এবং ইটালী, ফ্রান্স, তুরস্ক ও অন্যান্য স্থানের মিলিত রপ্তানীর পরিমাণ ২,৮২,৩০৪ পাউন্ডের বেশী ছিল না।

বাংলার রেশমের উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭৭৬-৮৫তে কোম্পানী (তিগ্রস্ত হয়। তখন তারা একচেটিয়া কারবারের অধিকার ত্যাগ করে ব্যক্তি(গত কারবারের সুযোগ দেয়। তাতেও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি দেখে আবার কোম্পানী নিজের একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে। ফরাসী বিপ-বের গোলযোগে ইংরেজদের রেশম কারবার মার খায়। ১৭৯২-এর মধ্যে অবস্থার খানিকটা উন্নতি ঘটে। চুক্তি(প্রথা বাতিল করে দালাল মারফৎ রেশম-সংগ্রহ নীতি গৃহীত হয়। ১৭৯৫ এর ৫ই ফেব্রুয়ারী ইংল্যান্ডের রেশমশিল্প সংস্থাগুলি কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরদের কাছে বাংলার রেশমের প্রচুর সরবরাহের আবেদন জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। ১৮০৭ এর মধ্যে কোম্পানীর রেশম ব্যবসায়ে মন্দা ভাব কেটে যায়। ইতালীর রেশম আমদানি বন্ধ হলে বাংলার রেশমের চাহিদা বাড়ে অত্যধিক। কয়েক বছরের মধ্যে কোম্পানীর কারখানাগুলিতে কাঁচা রেশম উৎপাদন হয় দ্বিগুণের কাছাকাছি। ১৮৩৩ এর চার্টার এ্যাক্টের নির্দেশে ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলার রেশম কারবার গুটিয়ে নিতে হয়।

১৮৭৬ এর মে মাসের Statistical Reporter এ রেশম শিল্পের বিবরণ পাওয়া যায়। রেশম শিল্পের যখন দ্রুত অবনতি ঘটছে এবং বিদেশে রেশমবস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হয়ে গেছে, এ বিবরণ তখনকার। জানা যায় যে, তখন মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ৪৫ টি ইউরোপীয় ফিলেচার ছিল, দেশীয়দের ফিলেচারের সংখ্যা ৬৭। ইউরোপীয়দের পরিচালিত ফিলেচার পাত্র বা বেসিন সংখ্যা ৩,৫০০ এর কম নয়। দেশীয়দের ছিল ১,৬০০ টি। মোট বেসিন সংখ্যা ৫,১০০। এ ছাড়া আরো ৯৭টি ছোট ছোট ফিলেচার ছিল দেশীয়দের নিজ নিজ গৃহে। তাতেও প্রায় ২০০ বেসিন ছিল। প্রতিটি বেসিনে দুজন লোক থাকে, কাটুনি ও পাকদার। সে হিসাবে একাজে মোট ১০,৬০০ জন নিযুক্ত(। এদের অর্ধেক দ(শ্রমিক। এছাড়া ছিল পিওন, ওভারসিয়ার ও ক্লার্ক। বছরে উৎপন্ন কাঁচা রেশমের পরিমাণ নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে বছরে আনুমানিক ৩০০০ মন (২,৪৬,০০০ পাউন্ড) কাঁচা রেশম উৎপন্ন হ'ত। প্রতি সের রেশমের মূল্য ১৪ টাকা ধরে উৎপন্ন রেশমের মূল্য দাঁড়ায় ১৬,৮০,০০০ টাকা। এই পরিমাণ রেশমের জন্য পলু চাষীদের দিতে হয় ১০,৮০,০০০ টাকা। কাটুনি ও পাকদারদের মজুরী ১,৮০,০০০ টাকা। এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যয় ২,৪০,০০০ টাকা। রেশম তৈরীর মোট খরচ ১৫,০০,০০০ টাকা হলে উদ্বৃত্ত থাকে ১,৮০,০০০ টাকা।

রেশমবস্ত্র বয়ন রেশমশিল্পের আরেকটি গু(ত্বপূর্ণ শাখা। এ জেলায় ১৩৭ টি গ্রামে তাঁত ছিল। তাঁতীর সংখ্যা ১,৯০০। ১৮৭৫ সালে ৮০-১০০ হাজার খানা ধুতি ও শাড়ি বোনা হয়েছে। এর মূল্য অন্যূন ৬,০০,০০০ টাকা, তাঁতীদের বয়ন মজুরী ১,০০,০০০ টাকা। ৫০ হাজার বিঘা (১৭ হাজার একর) জমিতে হয়েছে তুঁত চাষ। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট -এ এবং ওম্যালি তাঁর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ, ১৮৭৬ এর স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইংল্যান্ডে রেশমবস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হলেও রেশম বস্ত্রের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য বন্ধ হয়নি। ১৯১৪ তে প্রকাশিত ওম্যালি সম্পাদিত মুর্শিদাবাদ জেলার গেজেটিয়ারের নীচের উদ্ধৃতি থেকে তখনকার রেশমশিল্পের নির্ভরযোগ্য ও বিশদ বিবরণ মেলে-

'যদিও এই শিল্পের অবনতি ঘটেছে এবং ইউরোপীয় রেশম ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতা ও ইউরোপে প্রতিকূল শুল্ক ব্যবস্থার ফলে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে, তবু খাঙ(সুতা

কাটুনিরা তাঁদের ছোট স্থানীয় ফিলেচারে (বানক) যথেষ্ট পরিমাণ রেশম উৎপাদন করে। তারা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের থেকে বেশী দামে সব কোয়া কিনে নেয় এবং কোরা থান ও মটকা তৈরী করে। ভারতে, বিশেষত পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে এর চাহিদা যথেষ্ট। মীর্জাপুরের তাঁতীরা ১৯০৯-১০ সালে ৩৪,৭৫০ গজ রেশমবস্ত্র তৈরী করেছে, তার মূল্য ১,৩২,৭৯০ টাকা। তাদের তাঁতে তৈরি বস্ত্রের পরিমাণ ১৯০৭-০৮ সালে প্রায় ৪০,০০০ গজ, মূল্য ১,৮৯,৮৫০ টাকা। তুঁত চাষ ও পলুপালন চালু আছে প্রধানত কান্দী মহকুমার বড়এ(া থানায়, জঙ্গীপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ থানায়, ডোমকল মহকুমার রাণীনগর থানায়। বয়নশিল্পের প্রধান কেন্দ্র জঙ্গীপুর মহকুমার মীর্জাপুর থানায়, সদর মহকুমার হরিহরপাড়া ও দৌলতবাজারে। মীর্জাপুরের রেশমবস্ত্র সর্বোত্তম। অন্যান্য গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্র বালুচর, ইসলামপুর। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টে এবং ওম্যালি তাঁর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ১৮৭৬ এর স্ট্যাটিসটিকাল রিপোর্টারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কাদাই, সৈদাবাদ, বেলডাঙ্গা ও হরিহরপাড়ার বিশেষ এক শ্রেণীর রেশম বস্ত্রের নাম বালুচরী, কিন্তু বালুচরীর কারিগরেরা বালুচর গ্রামে বাস করে না, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে বাস করে। বালুচরী শিল্পের প্রধান কেন্দ্র বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জ (ওম্যালির ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ, পৃষ্ঠা ১৫২)।

এই শিল্পের অবনতির কারণগুলি হ'ল (১) ১৮৯২ সাল থেকে ফরাসী সরকারের শুল্ক নীতির ফলে রেশমবস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া। ২) ইউরোপ, জাপান ও চীন থেকে রেশম বস্ত্র রপ্তানী, (৩) ইতালীতে রেশমের প্রভূত উৎপাদন, (৪) বাংলার রেশমের নীচু মান। বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে দেশের অন্তর্বাণিজ্যেও রেশমের প্রভূত (তি হয়েছে। এদেশে রেশমের উৎপাদন হ্রাসের সবচেয়ে বড় কারণ পলু পোকার রোগ। শ্রী নৃত্যগোপাল মুখার্জী পলু পোকার মড়ক নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে রোগমুক্ত(উন্নত পলুপোকার বিছন তৈরীতে স(ম হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বহরমপুরে একটি নার্সারী স্থাপন করেন, তাতে ছিল সাতটি পলুপোকা পালনাগার এবং ৬২ বিঘা তুঁত চাষের জন্য জমি। অন্যান্য কয়েকটি জায়গাতেও নার্সারী স্থাপিত হয়। এই নার্সারীগুলো পলুচাষীকে রোগমুক্ত(পলুবীজ সরবরাহ করতে থাকে। বিজ্ঞানসম্মত পলুপালন শি(াদানের উদ্দেশ্যে বহরমপুরে একটি সেরিকালচার স্কুলও স্থাপিত হয়। রেশম বয়ন, রঙ করা ও ছাপাইয়ের উন্নতির জন্য ১৯২৭ সালে বহরমপুর সিল্ক টেক্‌নোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। পরে এই ইনস্টিটিউট কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৩০-৪০ সালে বাংলার রেশম শিল্পের চরম দুর্দিন আসে।

ইতিমধ্যে জাপানে রেশম শিল্পের প্রভূত উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার রেশম শিল্পের বিপর্যয় ঘটে। জাপান ভারতের রেশম বাজারও দখল করে নেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শু(হওয়ায় চীন ও জাপানের রেশম আর ভারতে আসে না। যুদ্ধের প্রয়োজনে প্যারাশুট তৈরীর জন্য রেশমের চাহিদা হঠাৎ খুব বেড়ে যায় এবং সরকারী সহযোগিতায় কয়েকটি ফিলেচার বা বানক তৈরী হয়। কিন্তু এই হঠাৎ শ্রীবৃদ্ধি নিতান্তই সাময়িক। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

সেকালে প্রচলিত নানারকম রেশম বস্ত্রের বর্ণনা ছাড়া রেশম শিল্পের অতীত গৌরবের সামগ্রিক পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রেশম বিশারদ শ্রী নৃত্যগোপাল মুখার্জী লিখিত 'মনোগ্রাফ অব্ দ্য সিল্ক ফেব্রিকস্ ইন বেঙ্গল' নামক পুস্তক থেকে এ বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

'ক' শ্রেণী — সাধারণ তাঁতে, অর্থাৎ সুতিবস্ত্র বয়ন করা হয় এমন তাঁতে রেশম বস্ত্র বোনা যায়। এই শ্রেণীভুক্ত((অ) সাধারণ বস্ত্র, ব্লিচিং করা কিংবা ব্লিচিং না করা কিংবা রং-যুক্ত(, (আ) ডোরাকাটা রেশম বস্ত্র, (ই) চেক অর্থাৎ চৌকো দাগযুক্ত(, (ঈ) পাড়যুক্ত(বস্ত্র, (উ) ছাপাকাপড়, (ঊ) বনহু।

'খ' শ্রেণী — নক্‌সী তাঁতে তৈরী কাপড় যাতে তাঁতেই নানা মূর্তির নক্সা তোলা যায়।

'গ' শ্রেণী — সূচী শিল্পযুক্ত(কাপড় ও অন্যান্য হাতে তৈরী কাপড়।

'ক'শ্রেণী --- (অ) খাম(রেশম দিয়ে সাধারণ বস্ত্র উৎপাদন করা যায়। ফিলেচারে প্রস্তুত রেশম দিয়ে সাধারণ কাপড় তৈরী হয় না। মটকা রেশম বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত। মীর্জাপুরের তাঁতীরা সাধারণত মালদহের খাম(রেশম, কখনো খুব উঁচু মানের ধালী বা বড়পলু রেশম ব্যবহার করে। ধালী রেশম থেকে সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র তৈরী হয়। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত(ঃ—

(১) গাউন পিস — এর জন্য ব্যবহৃত হয় পাক দেওয়া, ব্লিচিং করা কিংবা রং করা কাঁচা রেশম সুতো। চার রকম শৈলীতে সাদা গাউন পিস বোনা হয়। (ক) সাধারণ, (খ) টুইল বা ডিল্‌ড, (গ) ডোরাকাটা, (ঘ) চেককাটা।

সাধারণত পাশ্চাত্য মহিলারা পোষাক তৈরীতে গাউন পিস ব্যবহার করে, বাঙালী ভদ্রলোকেরা চাপকান, চোগা ও কোট তৈরীতে কাজে লাগায়।

(২) কোরা থান — ইউরোপে রপ্তানী হয়।

(৩) হাওয়াই বা সিল্ক মসলিন — ধালী রেশম থেকে তৈরী খুব সূক্ষ্ম কাপড়। এর থেকে সার্ট, কোট, চাপকান তৈরী হয়।

(৪) (মাল — ২ বর্গফুট মাপের মীর্জাপুরী (মালের খুব কদর।

(৫) আলোয়ান বা মোটা চাদর — গায়ে জড়ানোর মীর্জাপুরী চাদর।

(৬) সাদা ধুতি ও জোড় —(অর্থাৎ ধুতির সঙ্গে চাদরও বোনা হয় একসঙ্গে)।

(৭) মেখলা — আসামের মহিলারা বেশি ব্যবহার করেন।

(৮) মটকা — মটকা ধুতি ও শাড়ি মহারাষ্ট্রে বেশি রপ্তানী হয়।

(৯) মটকা ও খাম(— রেশম সুতো মিশিয়ে তৈরী কাপড়। দুরকম শ্রেণী, সাধারণ ও খেজুর ছড়ি।

(১০) মুর্শিদাবাদ এন্ডি—আসামের এন্ডি রেশমের নকল। বহরমপুরে এস. এস. বাগচী এন্ড কোম্পানী বিক্রি(করত।

(আ) ডোরা কাটা রেশম বস্ত্র ঃ—রঙীন ডোরাকাটা গাউন পিস দুই জাতীয়, রেখি ও ধারি। রেখি গাউন পিস কতকগুলি কালো রেখা যুক্ত(কিংবা জোড়া রেখা যুক্ত(। ধারি গাউন পিসের ডোরাগুলো বেশি চওড়া ও রঙীন। একই গাউন পিসে নানা রঙের চওড়া ডোরা থাকে। সবচেয়ে চওড়া ডোরার নামানুসারে এই ধারিগুলো লাল, হলদে, সবুজ, গাঢ় লাল, বনেশ (চকলেট রং)। এগুলো যায় আরব দেশে।

(ই) চেকবস্ত্র ঃ পাঁচরকম। চেকের প্রচলিত নাম চারকোনা। (১) রেশমের জমির ওপর চারকোনা ঘরগুলো ছোট বড় ও নানা রং-এর হয়। আরবদেশে রপ্তানী হয়। স্থানীয় ভাবে যে চেকবস্ত্রগুলি বিক্রি(হয় সেগুলি খুব ঘন বুনানী ও উৎকৃষ্ট। বালুচর (জিয়াগঞ্জ) অঞ্চলে জৈনরা সূক্ষ্ম চেকবস্ত্র ব্যবহার করে (২) চারকোনা বা চেক, সাদা জমি, চারকোনা প্রান্তরেখা চারটি রঙীন। চারকোনাগুলি অসমাকার, ছোট-বড়। (৩) 'মাত্র'— আরবে যায়। (৪) ফুলিকাট চেক—রেঙ্গুন বাজারে যায়। (৫) চেক মটকা—মহারাষ্ট্রে রপ্তানী হয়।

(ঈ) পাড়যুক্ত(বস্ত্র — শাড়ি, ধুতি, জোড়, চেলি, মটকার চাহিদা সারাদেশে।

শাড়ির পাড় ঃ তাজপাড়, কলকাপাড়, পদ্মপাড়, ভোমরাপাড়, ধুতিরপাড়, ধানীকটকাপাড়, ফিতাপাড়, ঘুনসিপাড়, চুড়িপাড়।

রিয়াস ঃ রঙীন পাড়। আসামের মহিলারা চাদরের মতো দেহের উর্ধাংশে জড়ায়।

(উ) ছাপা কাপড় ঃ কোরা থান ছাপিয়ে (মাল, দরজার পর্দা, স্কার্ফ ও নামাবলী তৈরীর শিল্প মুর্শিদাবাদে প্রায় লুপ্ত।

(ঊ) বনহু বা বন্ধন ঃ ছোপ ছোপ যুক্ত(বা গোলাকার রেখা যুক্ত(রঙীন কোরা বা মটকা অল্প ব্যবধানে শক্ত(শক্ত(গিঁট বেঁধে রেশমী বস্ত্রখন্ড গুলিকে রঙে চোবান হয়, তারপর পরিষ্কার করে শুকানো হয়। বাঁধনগুলি খুলে দিলে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। ছোপের বদলে রিং বা গোলাকার রেখা হলে তাকে বলে চুড়ি। রিংগুলি ছোট ও ঘন ঘন হলে সেই বস্ত্র খণ্ডকে বলে মতিচূড়। মতিচূড়ের স্কার্ফ ও পাগড়ি হয়। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বনহু ও চড়ির কদর দেখা যায়।

'খ' শ্রেণী — নক্সী তাঁতের কাপড় ঃ বালুচর বুটিদার শাড়ি বাংলার উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের খুব প্রিয় শাড়ি ছিল। শাড়ির জমি ছিল অলংকৃত, পাড় জমকালো, চার প্রান্তে অলংকৃত মূর্তি (বলা হ'ত কুঞ্জ), ফুল-লতা-পাতায় জমকালো আঁচল। লম্বায় দশ হাত, ৪২ বা ৪৫ ইঞ্চি বহর। উৎকৃষ্ট মানের বালুচর বুটিদার শাড়ি বুনতে ৩/৪ মাস লাগে। কখনো কখনো এই শাড়িতে আঁচল থাকে না, কেবল চারকোণে চারটি কল্কা বা কুঞ্জ (পদ্ম কুঁড়ি)।

'গ' শ্রেণী — (মাল এবং পাড় ও কোণ অলংকৃত শাল নক্সী তাঁতে তৈরী হয়। কাশ্মীরী (মাল ও শালের অনুকরণ। নক্সী তাঁতে টেবিলক্লথ ও বোনা হয়। শাল হ'ত ছয় হাত লম্বা এবং তিন হাত বহর। এই জেলায় কেবল একজনই উচ্চমানের শাড়ি, (মাল, শাল ও টেবিলক্লথ বুনতেন। তার নাম দুবরাজ। সাধারণত দুবরাজ নিজে বুনতেন না, তিনি তাঁতগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে নিতেন, অন্যে বুনত। দুবরাজ কখনো নিজের লোক ছাড়া অন্যকে তাঁত সাজিয়ে দিতেন না। দুবরাজ একসময় নিজেই শাল বুনতেন, জমিতে অলঙ্করণের বদলে থাকত শাস্ত্রের উক্তি(, বার্ধক্যে তিনি এধরণের শাল বোনা ছেড়ে দেন।

স্কার্ফ ও উত্তরীয় ঃ দুবরাজের তাঁতে স্কার্ফ ও উত্তরীয় বোনা হ'ত। সূচী কাজ করা রেশম বস্ত্র জৈন পরিবারে ও কিছু মুসলমান পরিবারে ব্যবহৃত হয়।

একসময়ে যখন ইংরেজ সামরিক অফিসাররা এজেলায় বাস করত তখন সিল্কের মোজা বোনা প্রচলিত ছিল।

ইউরোপে রপ্তানী হত কোরা থান, ছাপান (মাল, গাউন পিস, তসর বা বাফ্তা (তসর মেশানো সুতি)। রেঙ্গুনে রপ্তানী হ'ত ফুলিকা (মাল ও বনহু। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে রপ্তানী হত মটকা ও কোরার তৈরী মতিচূড় ও চুড়ি। আরবে রপ্তানী হয় চৌকাসর, ধারী ও মাত্র। চেলি কাপড়ের কদর ভারত জোড়া, ভারতের মারাঠী অধ্যুষিত যেকোন অঞ্চলে মটকা ধুতি ও শাড়ি যায়।

উপরে বর্ণিত রেশম বস্ত্রের সব প্রকারই মুর্শিদাবাদে তৈরী হ'ত।

বাংলার রেশম খাদির স্বীকৃতি ঃ

আজ স্বাধীন ভারতে খাদি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটলেও খাদির জন্ম পরাধীন ভারতে মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সহযোগী হিসাবে। গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ছিল একমাত্র ল(্য। ১৯১৭ সালে মহারাষ্ট্রের বিজাপুরে চরকায় সুতো কাটা ও সেই সুতোয় তাঁত কাপড় বোনার কাজ শু(হয়। খাদির জন্ম বিজাপুরে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খাদির আন্দোলনও যুক্ত(হয়। তখন সুতি কাপড়ের উৎপাদন ছিল খাদির একমাত্র কাজ। পরবর্তীকালে অখিল ভারত কাটুনী সংঘ স্থাপিত হয় (১৯২৩)। গান্ধীজীর অনুমোদনে বাংলার রেশম শিল্পীদের মহাজনের শোষণ ও দারিদ্র্য থেকে বাঁচাতে রেশম শিল্পকে খাদির স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯৩৪ সালে। ১৯২৫ সালে মুর্শিদাবাদের চক-ইসলামপুরে চন্দ্রকান্ত সাহা (চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতি), ১৯২৯ সালে বাঁকুড়া-বিষ্ণু(পুরে হনুমান দাস- জানকী দাস সারদা (সিল্ক-খাদি সেবামণ্ডল), পরে মুর্শিদাবাদে বি(াস পরিবার রেশম খাদি তৈরীর সংগঠন গড়ে তোলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সমস্ত স্বদেশী শিল্পের সংর(ণ ও উন্নয়নে যথাত্র(মে ১৯৫৩ ও ১৯৫৬ সালে স্থাপিত হয় অখিল ভারত খাদি বোর্ড এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন (কে. বি. আই. সি.) এবং কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড তৈরী হয় ১৯৫১ সালে। পশ্চিমবাংলায় রাজ্য খাদি বোর্ড তৈরী হয়। কমিশনের শর্তাবলী মেনে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত স্বীকৃত খাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা নানাভাবে কমিশনের সহায়তায় একেকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি না লাভ না লোকসান নীতি মেনে চলে। গ্রামীণ শিল্পীদের কর্মসংস্থান ও শোষণ মুক্তি(র সুযোগ দেওয়া এ সমিতিগুলির উদ্দেশ্য। এখানে পরিচালকগণ কোন লভ্যাংশ পান না। কেননা এগুলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া সমবায় আইন অনুসারে শিল্পীদের সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত খাদি সংস্থা আছে। এখানে সমস্ত সদস্যগণের মধ্যে লাভ লোকসান ভাগ হয়। এরাও খাদি কমিশনের স্বীকৃত। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৫৩-৫৪ সালে সর্বপ্রথম তিনটি খাদি সংস্থা তৈরী হয়। আজ ২০০১ সালে এখানে ৯৬ টি খাদি সংস্থা গড়ে উঠেছে। অন্যান্য জেলার সঙ্গে তুলনায় এ বিষয়ে এ জেলার প্রাধান্য সহজেই বোঝা যায়।

১৯৮৯-৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় রেশম প্রকল্পের কাজ শু(করেন। বেশী কর্মসংস্থান, তুঁতচাষী ও শিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নতি দেশে ও বিদেশের বাজারে রেশমের চাহিদা প্রভৃতির ল(্যে বি(ে ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় সুসংহত ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ৬৪.২৫ কোটি টাকার এই প্রকল্প চালু করে। বসনী ও কাটুনীরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য ১৯৮৯ সালে প্রণয়ন করা হয় পশ্চিমবঙ্গ রেশমকীট বীজ, রেশমগুটি ও রেশম সুতো উৎপাদন, সরবরাহ, বন্টন ও বিত্র(য় প্রতিনিয়ন্ত্রণ বিধিসমূহ -১৯৯১। বর্তমানে রেশম শিল্প অধিকারের কাজ গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮টি জায়গায় এ পর্যন্ত সহায়ক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্রগুলি জঙ্গীপুর, লালবাগ, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, কান্দী, জলঙ্গী, রাণীনগর ও বেলডাঙ্গায় অবস্থিত।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিচালিত খাদি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সারা ভারতে যে পাঁচটি সেরা প্রতিষ্ঠানকে গণ্য করেছে এবং অভিজ্ঞানপত্র দিয়েছে, তাদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতি অন্যতম।

রেশমের শাড়ি রং করা, ছাপানো প্রভৃতি কাজের জন্য বহরমপুরে পঞ্চাননতলায় কারখানা তৈরী হয়েছে। অধিকাংশ রং ছাপার কাজ হয় হুগলীর শ্রীরামপুরে, কখনো কখনো বেনারসে। কলকাতাতেও ঐ ধরনের কারখানা আছে।

মুর্শিদাবাদে ছাপা রেশম শাড়ির যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই জেলার গনকর মীর্জাপুর কোরিয়েল অর্থাৎ উচ্চমানের গরদ শাড়ি এখনো বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ শহরের নিকট বালুচরে (বর্তমান জিয়াগঞ্জ) যে রেশম শাড়ি পাওয়া যেত এককালে তার জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল। তখন তাঁতেই বালুচরী শাড়ির নক্সা তোলা হত। বর্তমানে বাঁকুড়া-বিষ্ণু(পুর অঞ্চলের তৈরী বালুচরী শাড়ির নক্সা জ্যাকার্ড পদ্ধতিতে তৈরী হয়। জেলার কোন কোন জায়গায়ও এপদ্ধতির ব্যবহার শু(হয়েছে।

আন্তঃরাজ্য স্তরে রেশম উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়।পশ্চিমবঙ্গের জেলা-ওয়ারি রেশম উৎপাদন পরিসংখ্যান বিচারে মালদহের স্থান সকলের ওপরে, তার পরই মুর্শিদাবাদ। কিন্তু রেশম বস্ত্র বয়নে মুর্শিদাবাদ সকলের ওপরে (সেরিকালচার ইন ওয়েস্টবেঙ্গল, জিওগ্রাফিক্যাল এ্যানালিসিস, ১৯৯২, শা(েতী মুখার্জী, পৃষ্ঠা ১২২) এখানে পশ্চিমবাংলার রেশম শিল্পে এই দুই প্রধান জেলার তুলনামূলক আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

মালদহ মূলত বাণিজ্যগত ভাবে পলুপালন অঞ্চল। এখানে পলুপালনকারীদের প্রধান উপজীবিকা তুঁতচাষ। এখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রেশম কোয়া উৎপন্ন হয় এবং কাটুনীদের কাছে বিত্রি(করা হয়। সুতো কাটাই-এর জন্য এই অঞ্চলটি প্রসিদ্ধ। কোয়ার কাঁচা উপাদান অর্থাৎ সঞ্চ বা কোয়ার বিছন সাধারণত মুর্শিদাবাদ থেকে আনা হয়। মালদহ বয়ন শিল্পে বিশেষ পারদর্শী নয়, তাই এখানকার উৎপন্ন রেশমের একটা বড়ো অংশ মুর্শিদাবাদ ও

পশ্চিমবাংলার অন্যান্য স্থান পাঠানো হয়।

এর বিপরীতে মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত বিছন উৎপাদনে, এখানে পলুপালন চাষীর সহযোগী বৃত্তি। তাই এখানে তুঁত গাছকে ধান বা পাটের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে। তুঁত চাষ কৃষকের অপ্রধান উপজীবিকা। অপরপ(, এই অঞ্চল রেশম বস্ত্র বোনায় উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পশ্চিমবাংলায় সমস্ত রকম রেশম বস্ত্র বয়নে এর স্থান সকলের শীর্ষে। এখানকার বোনা রেশম কাপড় ছাপাই ও রং করার জন্য শ্রীরামপুরে পাঠানো হয়।

খাদি ও মসলিন

'বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত। বস্ত্রশিল্পের জন্য এদেশ প্রাচীনকালেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ৌম, দুকূল, পত্রোর্ণা ও কার্পাসিক এই চারিপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ৌম শনের সুতায় প্রস্তুত মোটা কাপড়, কাশী ও উত্তরবঙ্গে ইহা নির্মিত হইত। এক জাতীয় সূ্ম বস্ত্রের নাম দুকূল। কৌটিল্য লিখিয়াছেন বঙ্গদেশীয় দুকূল শ্বেত ও স্নিগ্ধ, পুন্ড্র দেশীয় দুকূল শ্যাম ও মণির ন্যায় স্নিগ্ধ। পত্রোর্ণা রেশমের ন্যায় একজাতীয় কীটের লালায় তৈরী। মগধ ও উত্তরবঙ্গে এইজাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কার্পাসিক অর্থাৎ কার্পাস তুলোর কাপড়ের জন্য বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল। এইরূপে দেখা যায় যে খুব প্রাচীন কালেই বাংলার বস্ত্র শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বাংলা হইতে বহু পরিমাণ উৎকৃষ্ট সূ্ম বস্ত্র বিদেশে চালান যাইত। বাংলার যে মসলিন ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র জগতে বিখ্যাত ছিল অতি প্রাচীন কালেই তাহার উদ্ভব হইয়াছিল।' (বাংলাদেশের ইতিহাস-রমেশচন্দ্র মজুমদার)।

কার্পাস গাছ ভারতের আদি সম্পদ। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কার্পাস গাছ লাগানো হয়। ভারতের কার্পাসের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় হতে বহু শতাব্দী লাগে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ছাড়াও খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে লেখা চর্যাপদেও কার্পাসের উল্লেখ আছে। কার্পাসের তুলোয় চরকায় সুতো কেটে তাঁতে কাপড় বোনার রীতি বাংলার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। মোগলযুগে বাংলাদেশে কার্পাস তুলোর সুতোয় অতি সূ্ম মসলিন বস্ত্র তৈরী হয়ে দেশ বিদেশে রপ্তানী হ'ত। ঢাকাই মসলিন ছিল জগদ্বিখ্যাত। আর রেশম বস্ত্রে বিখ্যাত ছিল কাশিমবাজার। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের (১৮৭৬ খ্রীঃ) এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট্স অব্ বেঙ্গল গ্রন্থে ঢাকায় উৎপন্ন মসলিনের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। ডঃ টেলার আটত্রিশ রকম মসলিন বস্ত্রের কথা বলেছেন। মসলিন বস্ত্র নিয়ে নানা গল্প সারা দুনিয়ায় পর্যটক ও বিদেশী বণিকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার সুবাদার ঢাকা থেকে দিল্লীর মোগল দরবারে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে মসলিন বস্ত্র পাঠানো আবশ্যিক মনে করতেন। মুর্শিদকুলি খান (১৭০৪-১৭২৭ খ্রীঃ) ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ প্রথমে দেওয়ানখানা, পরে রাজধানীও স্থানান্তরিত করার পর এখানে রেশম বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মসলিন বস্ত্রের উৎপাদন হতে শু(করল । মুর্শিদকুলি দেওয়ানখানা মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলে (১৭০৪ খ্রীঃ) তাঁর সঙ্গে কিছু মসলিন কারিগরও এসেছিলেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিদেশী বণিক কোম্পানীর পুরনো কাগজ পত্রে, বিশেষতঃ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্রে রেশম ও রেশম বস্ত্রের সঙ্গে মসলিন রপ্তানীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইংরেজ রাজত্বের আবির্ভাবে বাংলার বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজ বণিক কোম্পানী ও কোম্পানীর দালালরা জোর করে দাদন দিয়ে মসলিন কারিগরদের মসলিন তৈরী করে তাদের দিতে বাধ্য করত। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্-বের ফলস্বরূপ ম্যানচেস্টার মিলের তৈরী কাপড় এদেশে রপ্তানী করার উদ্দেশ্যে এদেশে সুতি বস্ত্র ও মসলিন বস্ত্র শিল্পকে ইংরেজ ধ্বংস করে ফেলে।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১ খ্রীঃ) সময় স্বদেশী বস্ত্রের চাহিদা বাড়ে এবং দেশব্যাপী চরকায় সুতো কাটা শু(হয়। আমেদাবাদের মিলের কাপড়ের চাহিদা বাড়ে। তখন চরকায় মোটা সুতো তৈরী হ'ত, সূ্ম সুতো তৈরীর কোন উদ্দিষ্ট ল(্য ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর শিল্প(চিসম্মত পুর্নজীবনে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

অতি মিহি ঢাকাই মসলিনের বয়ন, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের পাটোলা, বিহারের সুজনি, ওড়িশার সম্বলপুরের রান, কা্মীরের খাদি শাল বয়ন, পাঞ্জাবের খেশ বয়ন এবং অন্ধ্রে কলমকারি ছাপা বিশেষ বিখ্যাত। বিশেষজ্ঞের নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা এই শিল্পগুলির জন্য আবশ্যক। অবহেলার ফলে এই শিল্পগুলির অধঃপতন ঘটেছে এবং অধিকাংশ নিশ্চিহ্(। খাদি ও গ্রামোন্নয়ন কমিশনও জাতীয় শিল্প(চিসম্মত বয়ন উদ্ধার করার সঙ্কল্প নেয়। বর্তমানে তাঁতী পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনে সাহায্য করা এবং অন্য শিল্পীদের প্রশি(ণের ব্যবস্থা করা কমিশনের কাজ।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের প্রেরণায় ঢাকার অতি মিহি মসলিন বস্ত্র পুন(জ্জীবনের চেষ্টা আরম্ভ হয়। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন দুটি স্থান বাছাই করে, পন্ড(ও বসোয়া। পন্ড(অন্ধ্রপ্রদেশের

শ্রীকাকুলাম জেলার একটি গ্রাম এবং বসোয়া পশ্চিমবাংলার বীরভূম জেলার একটি গ্রাম। বসোয়া গ্রামে খাদি আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার বাসিন্দা কালীচরণ শর্মাকে গবেষণার কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অল্পদিনের মধ্যে তিনি যখন বুঝলেন বীরভূমের ((আবহাওয়ায় সূ্ম সুতো তৈরী সম্ভব নয়, তখন চক-ইসলামপুর গ্রামের চন্দ্রকান্ত সাহার আমন্ত্রণে চক গ্রামে চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতির ভবনে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন, এবং ২৫০ পাউন্ড পর্যন্ত সুতো কাটতে স(ম হন। পরবর্তীকালে চন্দ্রকান্ত সমিতির চেষ্টায় ৬০০ পাউন্ড পর্যন্ত সুতো কাটা সম্ভব হয়েছে। আজকে পুরনো কিষান চরকার যুগ থেকে চরকার ভিন্ন যুগে প্রবেশ করেছি। এন.এম.সি. (নিউ মডেল চরকা) ও মহারাষ্ট্রের মিল শ্রমিক একাম্বর নাথের উদ্ভাবিত অম্বর চরকা হাতে সুতো কাটায় বৈপ-বিক পরিবর্তন এনেছে। অম্বর চরকার প্রবর্তন ছাড়া আধুনিক মসলিন তৈরীর চেষ্টা সফল হ'ত না। মোগল যুগের শিল্পীরা তাঁদের হাতের আঙুলের স্পর্শানুভূতিতে ব্যক্তি(গত দ(তায় অতি মিহি সুতো কাটতে পারতেন। আজ মসলিন উৎপাদনে ব্যক্তি(গত দ(ত অপে(া যন্ত্রের দ(তা প্রাধান্য পেয়েছে। খাদি মসলিন নাম দিয়ে প্রাচীন মসলিন থেকে বর্তমান মসলিনকে আলাদাভাবে চিহ্নি(ত করা হয়েছে। খাদি মসলিন সূ্ম থেকে সূ্মতর হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। একদা বাংলায় কার্পাস গাছের অভাব ছিল না। মুর্শিদাবাদের কাপাসডাঙ্গা গ্রাম নাম থেকেও এর পরো(প্রমাণ মেলে। কিন্তু কার্পাস গাছ এখানে আর তেমন দেখা যায় না। এখন সোভিন কার্পাস আসে দা(ণাত্য থেকে। কেরলে খাদি কমিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উন্নত ধরনের ফাইবার প্ল্যান্ট। সেখান থেকে আসে টেপ। এর ফলে কাটুনীর কাজে অনেক সুবিধা হয়েছে। চন্দ্রকান্ত সমিতির দৃষ্টান্তে মুর্শিদাবাদে ও মুর্শিদাবাদে বাইরেও মসলিনের কাজ উৎসাহের সঙ্গে হচ্ছে। এদের অবস্থার এখনো আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

পশ্চিমবাংলার ২৮০ টি খাদি সংস্থার মধ্যে যে ৯৬ টি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত তাদের নাম নিচে দেওয়া হ'ল।

১। মসলিন কাটাই মন্ডল, সৈদাবাদ কুঠীবাড়ি
২। চক-ইসলামপুর ইউনিয়ন নং ৪ কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস সোসাইটি লিমিটেড, চক-ইসলামপুর
৩। চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতি,চক-ইসলমাপুর
৪। মুর্শিদাবাদ রেশম খাদি শিল্প সমিতি, খাগড়া
৫। ইসলামপুর চক কেন্দ্র রেশম তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড
৬। শ্রীকান্তবাটি পশমশিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেড, গোপালনগর
৭। বি(্বাস রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ কার্যালয় (খাগড়া)
৮। টেঁয়া ভারতীয় কাটিয়া, মটকা, তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড
৯। ভারত খাদি সেবক সংস্থা, ৪, বি. বি. গুপ্ত রোড, খাগড়া বহরমপুর
১০। উপেন্দ্র স্মৃতিসেবা মন্দির, চক-ইসলামপুর
১১। সতীশ সর্বোদয় ভারতী, খাগড়া, বহরমপুর
১২। নেতাজী আশ্রম চরকা সংঘ, গাঙ্গাইন, আহিরন
১৩। ইসলামপুর চক বয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড, চক-ইসলামপুর
১৪। পিয়ারাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ, পিয়ারাপুর
১৫। নগর রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ, নগর
১৬। চক রেশমশিল্পী সমবায় সংঘ লিঃ, চক-ইসলামপুব
১৭। মীর্জাপুর রেশমশিল্পী সমবায় সংঘ লিঃ, মীর্জাপুর
১৮। গ্রামীণ শিল্পদ্যোগ সংস্থা, ডাঙ্গাপাড়া
১৯। অগ্রগামী উন্নয়ন সংঘ, ৭ রামবাবু লেন, খাগড়া
২০। মুর্শিদাবাদ গ্রামীণ সেবা সংঘ, ডোমকল
২১। খড়গ্রাম ব্লক খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমিতি, আলিনগর
২২। খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘ, ৭৭ বি বি গুপ্ত রোড, খাগড়া
২৩। সিল্ক খাদি উন্নয়ন সমিতি, নগর
২৪। বিবেকানন্দ আশ্রম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘ, পিয়ারপুর
২৫। মুর্শিদাবাদ সিল্ক উইভার্স কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ বি বি গুপ্ত রোড, খাগড়া, বহরমপুর
২৬। নিজাম রেশম ও খাদি আশ্রম, নগর
২৭। দৌলতাবাদ সিল্ক খাদি ও গ্রাম সেবা সংঘ, দৌলতাবাদ
২৮। পল্লীশ্রী খাদিকেন্দ্র, চক-ইসলামপুর
২৯। খাদি শিল্প উদ্যোগ ভবন, খাগড়া, বহরমপুর
৩০। সিল্ক খাদি অরগানাইজেশন, রঘুনাথগঞ্জ
৩১। মুর্শিদাবাদ রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংস্থা, মামুদপুর
৩২। মুর্শিদাবাদ রেশম মটকা কাটুনী সংস্থা, গোয়াস
৩৩। টেঁয়া খাদি শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, টেঁয়া
৩৪। কুটীরশিল্প উদ্যোগ সিল্ক সংস্থা, সাগরপাড়া
৩৫। পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, পলাডাঙ্গা
৩৬। গ্রামীণ কুটীরশিল্প ভবন, ৪৩ তিলপাড়া লেন
৩৭। মিডলে, পোঃ কান্দী

৩৮। মাড়গ্রাম রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘ
৩৯। বিধুভূষণ খাদি শিল্প সমিতি, গোল্লান
৪০। সাহপুর রেশম বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, মাড়গ্রাম
৪১। রামকৃষ(সিল্ক খাদি সেবা সমিতি, নয়াপাড়া
৪২। খাদি চরকা সংঘ, বড়দহ, পলাডাঙ্গা
৪৩। বেলডাঙ্গা খাদি গ্রামোদ্যোগ সমিতি, বেলডাঙ্গা
৪৪। হিকমপুর শিল্পমাটি সমিতি, হিকমপুর
৪৫। ইন্দ্রাণী শিল্প উন্নয়ন সমিতি, ইন্দ্রাণী
৪৬। কার্তিকেরপাড়া খাদি গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, কার্তিকেরপাড়া
৪৭। গ্রাম উন্নয়ন খাদিকেন্দ্র, রাণীনগর
৪৮।পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ সেবা কেন্দ্র,
২৬, গোয়ালপাড়া লেন গোরাবাজার
৪৯। বড়এ(া পল্লী শিল্প সিল্ক খাদি সংস্থান, বড়এ(া
৫০। দুর্গাদাস খাদি গ্রামোদ্যোগ কেন্দ্র, কোসিপুর
৫১। কমলা খাদি রেশম গ্রামোদ্যোগ সংঘ, কৃতিপুর
৫২। বিভূতিভূষণ সিল্ক খাদি সমিতি, পালপাড়া
৫৩। খাদি সিল্ক উইভার্স কো-অপাঃ সোসাইটি, কান্দী
৫৪। তেঁতুলিয়া গ্রাম সেবা সমিতি, গোকর্ণ
৫৫। নবীনচন্দ্র রেশম খাদি গ্রামোদ্যগ সমিতি, গোকর্ণ
৫৬। পশ্চিমবঙ্গ রেশম ও পল্লী শিল্পী সমিতি, বড়এ(া
৫৭। মডার্ণ রেশম খাদি সমিতি, পিয়ারপুর
৫৮। পা(লিয়া খাদি অম্বর ভবন, পা(লিয়া
৫৯। রেশম খাদি ও গ্রামোন্নয়ন সমিতি, নগর
৬০। বিজাপুর সিল্ক খাদি সেবা সংস্থা, গণকর
৬১। কল্যাণী খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন, তাঁতীপাড়া
৬২। অন্নপূর্ণা রেশম খাদি বয়ন সেবাসমিতি, নিউ পিয়ারপুর
৬৩। উত্তরপাড়া রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘ, মাড়গ্রাম
৬৪। গোরাপুর খাদি ও গ্রামীন শিল্প সংস্থান, গোরাপুর
৬৫। রামকৃষ(রেশম খাদি পল্লী উন্নয়ন সংস্থান, মাড়গ্রাম
৬৬। মডার্ণ খাদি উন্নয়ন সমিতি, খড়গ্রাম
৬৭। গুণানন্দবাটি রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সমিতি
৬৮। পুরন্দরপুর রেশম খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমিতি
৬৯। গয়েশপুর রেশম খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমিতি
৭০। দুর্গাকল্যাণ রেশম খাদি ও পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, তালসুন্দী
৭১। জেমো খাদি স্পিনিং সেন্টার, জেমো
৭২। হরিহরানন্দ আশ্রম, গুণানন্দবাটি
৭৩। নবগ্রাম সেবাসংঘ, কানফলা
৭৪। কান্দুরিয়া রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ মহাসংঘ, কান্দুরিয়া
৭৫। জয়পুর তপসিলী রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংস্থা, জয়পুর
৭৬। জীবন্তী তপসিলী রেশম খাদি গ্রামোদ্যোগ সংস্থা
৭৭। পল্লী শিল্প বিকাশ কেন্দ্র, হরিহরিয়া
৭৮। মা সন্তোষী খাদি গ্রামোদ্যোগ সংঘ, হরিপুর
৭৯। রেশম খাদি ও পল্লী শিল্প সংস্থা, নগর
৮০। নগড়া রেশম খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সংঘ
৮১। রাধাকান্ত বালুচরী রেশম খাদি শিল্প সমিতি,
নেহালিয়া, নটীপাড়া
৮২। জয়বুল্লিসা রেশম খাদি ও খাদি গ্রামোদ্যোগ সমিতি, মুড্ডা
৮৩। সেলফ্ হেলফ্ খাদি ডিলেজ ইন্ডাস্ট্রি সোসাইটিজ, পাঁচথুপি
৮৪। জোহিরা রেশম খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমিতি, জোহিরা
৮৫। বারিয়া নগর গ্রামীণ শিল্প উদ্যোগ সমিতি, বারিয়া নগর
৮৬। ত্রিমোহিনী সিল্ক খাদি সংস্থা, ত্রিমোহিনী
৮৭। শারদা সিল্ক খাদি ইন্ডাস্ট্রি কমিটি, গোপীনাথপুর
৮৮। সত্যবতী খাদি রেশম গ্রামোদ্যোগ সংগ, করজোড়া
৮৯। বেলডাঙ্গা খাদি গ্রামোদ্যোগ কার্যালয়, বেলডাঙ্গা
৯০। নওদা ব্লক সিল্ক খাদি অর্গানাইজেশন, ঝাউবোনা
৯১। চন্দ্রকান্ত খাদি গ্রামোদ্যোগ সেবাকেন্দ্র, দেবীপুর
৯২। জিয়াগঞ্জ রেশম খাদি সংঘ, জিয়াগঞ্জ
৯৩। মদনপুর রেশম খাদি গ্রামীণ শিল্প সংস্থা, মদনপুর
৯৪। রাধারমনজী মুরলীমনজী, মুর্শিদাবাদ
সিল্ক ও খাদি সমিতি সিমুকাগাছি
৯৫। তপসিলী খাদি গ্রামোদ্যোগ সমিতি, নগর
৯৬। উত্তরনগর সিল্ক উইভিং কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ, নগর

বালুচরী

মুর্শিদাবাদের বালুচরী শাড়ি আজও এক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে কিন্তু এর প্রকৃত ইতিহাস হয়তো অনেকেই জানেন না। মুর্শিদাবাদের বর্তমান জিয়াগঞ্জের নাম ছিল বালুচর। এই বালুচরের আশে পাশে অনেকগুলি গ্রাম ছিল, যেমন, বেলেপুকুর, রণসাগর, বালিগ্রাম, বাগডহর, দুবরোখালি, আমুইপাড়া ইত্যাদি। এই সব গ্রামে এক হাজার থেকে দুই হাজার পর্যন্ত শিল্পী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ বাস করতেন। এই শাড়ি তৈরি যে কবে থেকে আরম্ভ হয় তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা যায় ৪০০/৫০০ বছর আগে থেকে নবাব বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এই শিল্পে উৎসাহিত হন।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল মুর্শিদাবাদের এই বিশেষ শিল্পটি আজ অবলুপ্তির পথে। বর্তমানে বালুচরী শাড়ি বলে বাজারে যা

বিক্রী হচ্ছে তাকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে হনুমান দাস সারদা অনেকটা পুনর্জীবন দান করেছেন। তবে এই শাড়ি জ্যাকার্ড মেশিনের সাহায্যে তৈরি হচ্ছে। গ্রাফ পেপারের ওপর পছন্দমত ডিজাইন এঁকে নিয়ে নিয়ানো কার্ড কাটিং মেশিনের সাহায্যে বিশেষ ধরনের লম্বা লম্বা কার্ড বোর্ডে গ্রাফে আঁকা ডিজাইন পাঞ্চ করে সুতোর সাহায্যে সেগুলিকে পর পর ঝুলিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। জ্যাকার্ড মেশিনে সাধারণত ২০০/৪০০ অথবা ৬০০ হুক থাকে। যত বেশী সংখ্যক হুকের জ্যাকার্ড হবে তত জমকালো ডিজাইন বোনা সম্ভব।

তখনকার দিনে শিল্পী তার অসামান্য দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে বিভিন্ন রকমের নক্সা কল্পনা করে নিয়ে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে যেমন জালা পদ্ধতি, উপরে জাঁক এবং নীচের অংশ পাখির মাচা ইত্যাদি করে তাঁত বুনবার উপযোগী করে তৈরী করে নিতেন। তানা ভরনা ও বাঁশ তো থাকতই। তারপর শিল্পী যে নক্সা তুলবেন সেই নক্সার জন্য সাজানো সুতোগুলি কয়েকটি কাঠিতে জড়িয়ে নেবার পর সেই কাঠিগুলি একটা বাঁশ বা কাঠের ওপর বেঁধে দেওয়া হ'ত এবং সেই তাঁতের মাথার ওপর একটি ছেলের বসার ব্যবস্থা থাকত। নক্সার প্রয়োজন মত বিশেষ ভাবে কাঠিতে বাঁধা সুতো গুণ নীচের তানার সুতোর সঙ্গে বাঁধা থাকত। বালুচরী শাড়ি শিল্পী একা বুনতে পারতেন না। তাঁতের ওপর যে ছেলেটি বসে থাকত সে শিল্পীর ছড়ার সুরের ছন্দে প্রয়োজন মত নক্সার জন্য বিশেষভাবে সুতো জড়ানো কাঠিটি তুলে ধরতো তাতে নক্সা অনুযায়ী নীচের তানা সুতোর গুণ উপরে উঠলে শিল্পী তার নিপুণ হাতে ছোট্ট লোহার মাকুটির মধ্যে যে ভরনার সুতো থাকত সেটি তানার মধ্যে ঠেলে দিয়ে রীড়ের সাহায্যে টেনে সুতোটাকে বসিয়ে দিতেন। যার জন্য এই বালুচরী তাঁতকে Draw-boy-loom বলা হয়। এই তাঁতগুলি সাধারণত মাটির ঠাণ্ডা ঘরে বসানো থাকত এবং ট্রেডলগুলি মাটির গর্তের মধ্যে থাকত। রেশমজাত জিনিস বুনতে গেলে কিছুটা আর্দ্রতার প্রয়োজন যার জন্য মাটির ঘরেই তাঁত তৈরী করা হ'ত ভাল জমকালো নক্সা শাড়ি বুনতে কমপক্ষে ছ'মাস সময় লাগত। তখনকার দিনে প্রয়োজনীয় সুতো ভেজিটেবল ডাই দিয়ে রং করা হ'ত।

শাড়ির উপর যেসব নক্সা করা হ'ত তার মধ্যে কয়েকটি নাম হল আশারূপী নক্সা, কল্কা বুটিদার নক্সা, গুণবাহার নক্সা ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের নক্সা শাড়ি, পাড়ে হাতি, ঘোড়া ও মানুষের শোভাযাত্রা চলছে, নবাব গড়গড়া খাচ্ছেন, প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির চেহারা, লতাপাতা, মসজিদ অনেক কিছুই নক্সা করা হ'ত। নামাবলীতে সুন্দরভাবে চারিধারে নক্সা তুলে জমিতে বিভিন্ন রং-এর সুতো দিয়ে হরিনাম বোনা সত্যিই বিস্ময়কর। (মালের চারধারেও নাম বুনে দেওয়া হ'ত।

বালুচরী শাড়ি বা অন্যান্য কাজের সঙ্গে যে শিল্পীর নাম অমর হয়ে আছে তার নাম ছিল 'দুবরাজ'। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে তিনি চামড়ার ঢোল, ডুবকি, চটপটি প্রভৃতি তৈরী করে মেলায় মেলায় ঘুরে বিক্রি করতেন। হঠাৎ এক মেলাতে এসে কবিগান শুনে তাঁর কবি হওয়ার ইচ্ছে হয়। তাঁর স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে একবার কিছু শুনলেই সেটা তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে যেত। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। কবির দল গড়ে ছিলেন তিনি। জীবনের শেষদিকে বালুচরে এসে এক মুসলমান শিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এই শিল্পী বালুচরীর বিভিন্ন রকম জিনিস বোনার কাজে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি যে কোন রকমের নক্সা তার মন থেকে ভেবে নিয়ে কাপড় তৈরী করে ফেলতে পারতেন। দুবরাজ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তার ঐ কাজ দেখে নিজের অসামান্য প্রতিভাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজ শিখে নেন। মানুষের চেহারা, ঠাকুর-দেবতার মূর্তি, ঠাকুর বাড়ী, মসজিদ নামাবলী, বিভিন্ন ধরনের টেবিলক্লথ, স্কার্ফ, (মাল, তাঁর কিছু অসাধ্য ছিল না।

দুবরাজ কিন্তু বালুচরে থাকতেন না। থাকতেন বাহাদুরপুরে, সেখানেই তাঁর তাঁত ছিল। আমাইপাড়া, বাগডহর, বালিগ্রাম, রণসাগর, বেলেপুকুর, দুবড়োখালি প্রভৃতি গ্রামে বিভিন্ন তাঁতীদের গৃহে এইসব নক্সী ফুলদার শাড়ি, নামাবলী, শাল, টেবিলক্লথ, স্কার্ফ, (মাল প্রভৃতি বোনা হ'ত, কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্যই বালুচরী রেশম দ্রব্য নামে বাজারে পরিচিত ছিল।

দুবরাজের পরবর্তীকালে যাঁরা বালুচরী পদ্ধতিতে কাজ করেছেন তাঁরা হলেন—গোষ্ঠ কর্মকার, যোগীকর, প্রভাস সরকার, বৈষ্ণব কলিঠা, শশীভূষণ দত্ত, মৃত্যুঞ্জয় সরকার, হেম ভট্টাচার্য প্রমুখ। লর্ড লিনলিথগো যখন এই দেশের ভাইসরয় ছিলেন হেম ভট্টাচার্য মশাই তখন তাঁর প্রতিকৃতি নিখুঁতভাবে একখানি (মালে তুলে তাঁকে উপহার দেন।

বালুচরী ও বিভিন্ন প্রকার জিনিসের সঙ্গে সুধাংশেখর বাগচীর সংগ্রহশালায় আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগেকার বালুচরী পদ্ধতিতে বোনা সিল্কের যে নামাবলী আছে, তা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। বর্তমানে নামবলীখানির অত্যন্ত জীর্ণজশা। এর পর ছবির মাধ্যমেই স্মৃতিটুকু ধরে রাখতে হবে।

বালাপোষ

কথিত আছে যে শীতকালে শাল দোশালা গায়ে দিতে দিতে বিরক্ত(মুর্শিদকুলি খাঁর সৌখিন ও বিলাসী জামাতা সুজাউদ্দিন-এর শখেই উদ্ভব হয় বালাপোষের। তাঁর ফরমাস মতো মুর্শিদাবাদ নগরীর এক নামজাদা খলিফা রমজান সেখ উদ্ভাবন করেন বালাপোষের - যা অচিরেই সুধীজনের সমাদরের বস্তু হয়ে ওঠে।

বালাপোষে ব্যবহৃত হয় লম্বা আঁশওয়ালা বিশেষ ধরণের কার্পাস তুলো। প্রথমে কার্পাসের বীজ ছাড়িয়ে তাকে লাল রঙে চোবানো হয়। এরপর রোদে শুকিয়ে নিলে তৈরী হয়ে যায় বালাপোষের তুলো। দ(ধুনুরি এরপর তুলোটাকে ধুনে দেন। যে কোন ধুনুরি এই তুলো ধুনতে পারে না কেননা খানদানী বালাপোষের মাঝে কোন সেলাই থাকেনা। পাশের সেলাই-ই ধরে রাখে মাঝের তুলোকে, কাজেই তুলো ধোনার কাজে প্রয়োজন হয় বিশেষ দ(তার। ধুনুরি তুলো ধুনতে থাকলে ফুরফুরে তুলো গিয়ে পড়ে ৪.৫ X ১৮ ফুট মাপের বিশেষ ধরণের মলমল কাপড়ের উপর। এই তুলো পড়তে হবে সুষমভাবে - কোথাও পু(কোথাও পাতলা হলে চলবে না। এই তুলোতে থাকতে হবে একটু খসখসে ভাব নতুবা তা বালাপোষের কাপড়ে আটকে থাকবে না। তুলো ধোনার আগে তাতে মেশানো হয় দামী আতর। যত্ন করে ব্যবহার করলে সেই আতরের গন্ধ ৪০-৫০ বছর থেকে যায়।

তুলো ধোনার পর আরেকটি কাপড় দিয়ে প্রান্তটিকে আটকানো হয় যাকে বলা হয় সর্গজে বন্ধ। এরপর হচ্ছে আসল সেলাই এর কাজ - যার পোষাকী নাম আসাদ সেলাই। খরিদ্দারের চাহিদামত বালাপোষের একপিঠে রেশম কাপড় ও অন্য দিকে ভালো মখমল বা খাদি বা অন্য সুতি বস্ত্র দেওয়া হয় আবরোয়া হিসাবে। আগে ব্যবহৃত হত ঢাকাই মসলিন। সেইসব কুলীন বালাপোষের ওজন হ'ত একপোয়া থেকে দেড়পোয়ার মধ্যে।

আবরোয়ার বাইরে বালাপোষের প্রান্তসীমায় বসানো হয় সঞ্জাব বা পাড়। বালাপোষের পাড় হয় দুধরণের - বরফি আর লাহারিয়া। বরফি হ'ল চৌকো ঘর আর বিভিন্ন রঙের টানা ফিতের কাজকে হলা হয় লাহারিয়া। আসল বালাপোষের ভিতরে গায়ে কোন সেলাই থাকে না। সোলাই থাকে একমাত্র বর্ডারে। দ(শিল্পীর সেই প্রান্তসীমার সেলাই-ই ধরে রাখে বালাপোষের তুলোকে। দ(হাতে তৈরী বালাপোষের পাড়ের সেলাই-এর গুণেই তুলো সমান থাকবে তা গুটিয়ে বা সরে একধারে চলে আসবে না, হবেনা কোথাও পু(বা পাতলা। শিল্পীর আসল নৈপুন্য সেখানেই।

আজ আর এই শিল্পের তেমন কোন কদর নেই। বাজারে পাওয়া যায়না ভালো তুলো বা আতর। নেই তেমন দ(শিল্পীও। এখন শর্টকাটে কাজ সারার ল(্য বালাপোষের মাঝেও বরফি সেলাই দেওয়া হয়, বাজারে তাই বিকোয় মুর্শিদাবাদের খানদানী বালাপোষ হিসাবে। তবু এরই মধ্যে দু'একজন শিল্পী ধরে রেখেছেন সেই ঐতিহ্যমন্ডিত বালাপোষের ধারা। এদের শিল্পনৈপুন্য আজকের যন্ত্রনির্ভর সভ্যতারও বিস্ময় উদ্রেক করে। তবে প্রয়োজনীয় আনুকুল্যের অভাবে এরাও আজ বিলুপ্তির মুখে। আসল খানদানী বালাপোষ তৈরীতে যে শ্রম এবং দ(তা লাগে তার দাম দিতে চাননা আজকের ত্রে(তারা। কাজেই জেলার ঐতিহ্যমন্ডিত এই শিল্পটি লুপ্ত হয়ে যাওয়া হয়তো এখন স্রেফ সময়ের অপে(া।

কম্বল শিল্প

মুর্শিদাবাদ জেলায় কম্বল শিল্পটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে রঘুনাথগঞ্জ শহর সংলগ্ন শ্রীকান্তবাটীতে । শহর সংলগ্ন খড়খড়ি নদীর পশ্চিমপাড়ে শ্রীকান্তবাটী মৌজায় গোপালনগর গ্রামে পশম শিল্পীদের বাস। বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপু(যেরা এসেছিলেন গড়বাল বা গাড়োয়াল থেকে । সেই থেকে এলাকাটির নামই হয়ে গেছে গাড়োলিপাড়া।

এই গ্রামের বাসিন্দারা ভেড়ার লোম দিয়ে সুতলি পাকিয়ে কম্বল, আসন প্রভৃতি তৈরী করেন। মোটামুটি বাংলা জানলেও এই শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক হিন্দি ভাষায় কথা বলেন, নিজেদের পরিচয় দেন পাল - (ত্রিয় বলে। কম্বল বোনা এদের জাত ব্যবসা। আগে এরা নিজেরাই ভেড়া পুষতেন, এখন সেই রেওয়াজ নেই বললেই চলে।

এই শিল্পীদের থেকে পশম শিল্প শিখেছেন কিছু মুসলমান জোলা সম্প্রদায়ের মানুষ । এরাও বাস করেন গোপাল নগরেই। এরা কম্বল ও কম্বলের আসন তৈরী করে নিজেরাই ফেরী করে বিক্রি(করেন। এভাবে ফেরী করে বিক্রি(করার ব্যবহারিক অসুবিধা থেকে মুক্তি(পেতে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য এদের মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়। মহাজনী শোষণ থেকে বাঁচতে ১৯৫৬ সালে তৈরী হয়েছিল শ্রীকান্তবাটী পশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেড। কিন্তু এখন এই সমিতিরও বিশেষ সক্রি(য়তা নেই ।

একসময় কম্বলের আসনকে শুচি বলে গন্য করা হ'ত। পূজাহি(কে ব্যবহৃত হ'ত কম্বলের আসন। এখন আর সেদিন নেই। চাহিদা কমেছে কম্বলের আসনের । বিকল্প আসনে ছেয়ে গেছে বাজার । তবু কম্বল শিল্পটা এখনও টিকে আছে - স্বল্পবিত্ত মানুষদের শীত কাটানোর একমাত্র সম্বল বলেই।

পাটজাত শিল্প

জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০০ - ২০০১ আর্থিক বর্ষে জেলার ১৪১ হাজার হেক্টর জমিতে উৎপাদিত পাটের পরিমাণ ১৯০১.৫ হাজার টন।

জেলার প্রচুর পাটের উৎপাদন হলেও পাট নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য ভারী শিল্প জেলায় গড়ে ওঠেনি। বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যক্তি(গত উদ্যোগে কোথাও কোথাও পাট দিয়ে কিছু শিল্পদ্রব্য তৈরী হয়ে থাকে। সরকারী খাতায় রেজিস্ট্রিকৃত এমন উদ্যোগের সংখ্যা ৫টি এবং শিল্পে নিযুক্ত(কর্মীসংখ্যা ১০। যেহেতু এটি কোন সংগঠিত শিল্প নয় এবং একান্তভাবেই পাটজাত শিল্পদ্রব্য তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন শিল্পী এমুহূর্তে জেলায় নেই সেহেতু এই শিল্পে নিযুক্ত(কর্মীসংখ্যা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তবে যেহেতু এটা অবসরকালীন কুটীর শিল্প হিসাবে প্রচলিত সেহেতু এটা বলা অসঙ্গত হবে না এই শিল্পে শ্রম দেন এমন শিল্পীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশী।

সরকারী প্রকল্প 'ডোকরা' যখন চালু ছিল তখন বেশ কিছু গ্রামীণ হস্তশিল্পীকে পাটজাত দ্রব্য তৈরীর প্রশি(ণ দেওয়া হয়। সেই সব প্রশি(ত শিল্পীরা এখনও গ্রামে গঞ্জে কাজ করে চলেছেন।

পাট থেকে দড়ি তৈরী গ্রামীণ মানুষদের প্রায় অবশ্যকর্তব্য। গ্রামীণ জীবনে দড়ির ব্যবহার ব্যাপক। গ(-ছাগল বাঁধা, ঘর ছাওয়া, বেড়া বাঁধা প্রভৃতি কাজে দড়ির ব্যবহার হয়ে থাকে। কুয়োর জল তোলার জন্য বা কাপড়জামা শুকোনোর প্রয়োজনে দড়ির ব্যবহারও যথেষ্ট। অধুনা নাইলনের দড়ির প্রচলন হলেও পাটের দড়ির ব্যবহারও কম নয়। গ্রামের লোকেরা প্রয়োজনের সময় দরকার মত দড়ি কেটে নেয়। বর্ষার সময় গ্রামের লোকেরা সময় কাটানোর পাশাপাশি কিছু বাড়তি অর্থ উপার্জনের ল(্যও দড়ি কেটে থাকে। টাকু নামক যন্ত্র বা ইংরাজী ত্র(শ (x) চিহ্নে(র মতো 'ঢ্যাড়া' - র সাহায্যে গ্রামের লোকেরা দড়ি কেটে থাকে। এই দড়ি স(হয়। পরে সেই দড়িকে প্রয়োজন মত দুহারা, তিনহারা বা চারহারা করে পাকিয়ে নেওয়া হয়। দুহারা বা তিনহারা দড়িকে আরো শক্ত(পোক্ত(করার জন্য আবার দুহারা বা তিনহারা করে পাকানো হয়। একে বলা হয় 'দড়ি ভাঙ্গানো'।

দড়ি তৈরীর পাশাপাশি পাট থেকে তৈরী হয় সৌখিন শিল্পদ্রব্য। ব্যাগ, পাপোষ, টেবিল ম্যাট বা টেলিফোনের কভারের মতো সৌখিন দ্রব্য পাট থেকে তৈরী হয়। পাট থেকে তৈরী হয় দোলনাও। কখনো কখনো সরকারী সংস্থা মঞ্জুষা গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের কাছ থেকে এই সমস্ত শিল্প সামগ্রী কিনে নেয় ও বিপণন করে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। সুলভ কাঁচামাল ও অঢেল শ্রমশক্তি(র যোগান থাকলেও উপযুক্ত(বিপণন পরিকাঠামো না থাকায় এই শিল্পটি তেমন ভাবে বিকশিত হতে পারছে না।

সম্প্রতি এজেলায় পাটকাঠি থেকে পেপার বোর্ড তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। এর ফলে কিছু কর্মসংস্থান হয়েছে। জেলায় এ ধরণের বহু উদ্যোগ গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে - যা বেকার সমস্যা জর্জরিত জেলায় বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারে।

কাঁসা পেতল শিল্প

মুর্শিদাবাদের যে শিল্পগুলো জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঁসা শিল্প। অন্যান্য কুটীরশিল্পের মতো মনে হয় এ শিল্পটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদে সরে এসেছে। শোনা যায় নবাবী আমলে বঙ্গদেশে যখন ব্যাপক বর্গীর আত্র(মণ হয়, বড়নগর ও ধননগর থেকে বহু শিল্পী মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া ও কান্দীতে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। এরা জাতিতে কংসবণিক। এদের শিল্পকলা খাগড়ার কাঁসা শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মুর্শিদাবাদের খাগড়ার কাঁসা শিল্প শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল। মুর্শিদাবাদের কাঁসার তৈরী দ্রব্য ভারতের বাইরেও রপ্তানী হ'ত।

বহরমপুর শহরে এত বেশী সংখ্যক কাঁসা শিল্পী বাস করতেন যে একটি মৌজার নামই কাঁসারীবাজার মৌজা। তাছাড়া খাগড়া কাঁসারীপট্টিতে বহু কাঁসা শিল্পী বাস করতেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে কাঁসারীবাজার মৌজা ও কাঁসারীপট্টি মিলিয়ে প্রায় ১৮০টি কারখানা ছিল। সেখানে কাঁসা এবং কাঁসা থেকে বাসন ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য তৈরী করতেন দ(কাঁসা শিল্পীরা। শুধুমাত্র বহরমপুর শহরে প্রায় একহাজার কাঁসা শিল্পী ছিলেন এবং এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল জনসমষ্টি ছিল তিন থেকে চার হাজারের মত।

কান্দী অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। এই শতকের পাঁচের দশকের প্রথম দিকে কান্দীতে ৩২টি কারখানা ছিল এবং ২৫০ জন কারিগর ছিলেন। এখানকার তৈরী দ্রব্য পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে, বিহার, উড়িষ্যা, লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত বিক্র(ী হ'ত। কান্দী অঞ্চলের বায়েন সম্প্রদায়ভুক্ত(ব্যক্তি(রা কাঁসা শিল্প দ্রব্য বাইরের বাজারে বিক্র(ী করার ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বড়নগর ও জঙ্গীপুরের কাঁসা শিল্পের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের কাঁসা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ঋষি মিস্ত্রী, সুধীররঞ্জন মিস্ত্রী, গোবর্দ্ধন মিস্ত্রী, দুলাল

মিস্ত্রী, পতিত পাবন মিস্ত্রী, ননী মিস্ত্রী, কালিদাস কাঁসারী, বিষ্টু কাঁসারী, তারা কাঁসারী, ফনী চুটকী, দাশু মিস্ত্রী, বাঁকা কাঁসারী প্রভৃতি। ১৯৩১-৩২ সালে বৈদ্যনাথ দাস নামে একজন মূক শিল্পীর কাঁসার ডিসের উপর খোদাই করা জেনারেল তোজো ও রাজা হিরোহিতোর ছবি জাপানের এক প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্পের এই অতীত ইতিহাস বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায়। ১৯৯১-৯২ সালে সমগ্র বহরমপুরে মাত্র ৫টি কাঁসার বাসন তৈরীর কারখানা ছিল। ১৯৯২ সালে কাঁসারী পট্টি, কুঞ্জঘাটা ও নদীর বিপরীত পাড়ে ১৯টি পিতলের কারখানা ছিল। কান্দীতে কাঁসার বাসন তৈরীর কারখানা ছিল মোট ৫টি, বড়নগরে কাঁসার বাসন তৈরীর কোন কারখানা ছিল না। ঐ সময়ে সরকারী পরিসংখ্যানে বহরমপুরে ৪১টি ইউনিট ও ৪১ জন শিল্পীর নাম নথীভুক্ত(থাকলেও কাঁসা ও পিতল আলাদা করা ছিল না। বর্তমানে ২০০১ সালে সরকারী পরিসংখ্যানে ২৫০ জন শিল্পীর নাম তালিকাভুক্ত(করা আছে। কিন্তু এখানেও কাঁসা ও পিতলের কারিগরদের নাম পৃথক করা নেই। বর্তমানে শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এখন বহরমপুরে ৫-৭ জন দ(কাঁসা শিল্পী রয়েছেন। এরাই অর্ধ-দ(কারিগরদের সহায়তায় কাঁসার বিভিন্ন দ্রব্য তৈরী করে থাকেন। বহরমপুরে বর্তমানে পিতলের ৪-৫ জন দ(শিল্পী আছেন। এদের প্রত্যেকের উৎপাদন ইউনিটে ১০, ১২, ১৫ জন করে কারিগর কাজ করেন।

কান্দীতে বর্তমানে কাঁসার বাসন তৈরীতে দুই / তিন ঘরের অধিক শিল্পী নিযুক্ত(নেই। ১৯৯১-৯২ সালে দেখা গেছে খাগড়াই কাঁসার বাসন হিসাবে বিত্র(ীত অনেক বাসন তৈরী হত কান্দীতে।

বিশুদ্ধ কাঁসা তৈরী হয় সাত ভাগ তামা ও দুভাগ রাঙ-এর মিশ্রণে। বিশুদ্ধ কাঁসা-ই খাগড়াই কাঁসার বৈশিষ্ট্য। আট ভাগ তামার সঙ্গে দু ভাগ রাঙের মিশ্রণে নিকৃষ্ট কাঁসাও তৈরী হয়। অনেক সময় কাঁসা তৈরীতে দস্তাও মেশানো হয়, এইরূপ হলে তা পেটাই করা যায় না। কাঁসা শিল্পীদের মতে বিশুদ্ধ কাঁসায় টক দ্রব্য রাখলেও কোনরূপ দাগ পড়বে না।

পিতলের ে(ত্রে তামা ও দস্তা মেশানো হয়, ১০:৪ অনুপাতে, আর ভরণ তৈরী হয় ১:১ অনুপাতে। তামা ও রাঙ গলিয়ে আজ আর মুর্শিদাবাদে কাঁসা তৈরী হয় না। ফলে এজন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি(গত দ(তা ত্র(মশঃ বিলুপ্তির পথে।

মূলত পুরোনো বা ভাঙা কাঁসা—যাকে খুঁট' বলা হয় তাই বর্তমানে কাঁসা শিল্পে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার হয়। এই খুঁট গলিয়েই নতুন শিল্পদ্রব্য তৈরী হয়। এই পুরোনো বা ভাঙা কাঁসা মেলে পুরনো ও ভাঙা কাসার বাসন বিত্রে(তা বা বন্ধকীদের কাছ থেকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ওদেশ থেকে আসা বহু মানুষ জলের দামে বিপুল পরিমাণে পুরোনো কাঁসার বাসন বিত্র(ী করতে বাধ্য হয়েছিল, এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন মহাজন সেই মজুত কাজে লাগাচ্ছে। বর্তমানে কাঁচামাল আসে কলকাতা থেকে এবং স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে।

১৯৯১-৯২ এ ভাঙা কাঁসার দাম ছিল ১৬০ টাকা কেজি, নতুন কাঁসার বাসনের দাম ছিল ২০০-৩০০ টাকা কেজি। বর্তমানে ভাঙা কাঁসা বা খুঁটের দাম হল ১৯০ টাকা কেজি এবং বিশুদ্ধ নূতন কাঁসার দাম ৩২৫ কেজি।

তাছাড়া এক ধরনের কাঁসার কথা শিল্পীরা বলেন, যেটিকে ওরা জাহাজ ভাঙা বা মেটাল বলে অভিহিত করেছেন। এগুলো কলকাতা থেকে আসে। এর ত্র(য়মূল্য হ'ল ১৪০.০০ টাকা কেজি এবং এই মেটাল দিয়ে যে বাসন তৈরী হয় তার বিত্র(য়মূল্য হ'ল ২৫০.০০ টাকা কেজি।

ভাঙা পিতলের দাম বর্তমানে ৮০.০০ টাকা কেজি, পিতলের নূতন শীটের মূল্য ১৪০.০০ টাকা কেজি। গোল্ডেন শীট পিতলের মূল্য ১৭০.০০ টাকা কেজি। এই পেতলের শীট কিনে শিল্পীরা সৌখিন জিনিষ (যেমন সিংহাসন, পালতোলা নৌকা), ওয়াল পে-ট তৈরী করেন এবং পিস হিসাবেও এই পিতলের শীট বিত্র(ী হয়ে থকে।

কাঁসার বাসন দুই ভাবে হতে পারে ১) পেটাই এবং ২) ঢালাই। কারিগরেরা মহাজনের কাছ থেকে খুঁট সংগ্রহ করে তা আগুনের উত্তাপে গলিয়ে গোল গোল মুচিতে ঢালেন। মুচি এখন কলকাতার বড় বাজার থেকে কিনতে হয়। অনেক আগে এঁটেল মাটি, তুষ ও পাটের ফ্যাসা মিশিয়ে মুচি তৈরী করে রোদে শুকিয়ে ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হ'ত। বিভিন্ন আকৃতির মুচিতে কাঁসার তাল গলিয়ে ঢালা হ'ত, ঐ তাল সাঁড়াশী দিয়ে আগুনে লাল করে নিয়ে একজন নিহানের ওপর ধরেন এবং ৭/৮ জন ঐ লাল জিনিষটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিটিয়ে সম্প্রসারিত করেন। তারপর লাল নিহানের ওপর এটি ধরে দুজন কারিগর প্রায় তিন চতুর্থাংশ আকৃতিতে নিয়ে আসার পর রেত দিয়ে ঘষে সমান করে নিয়ে নেহালী দিয়ে চেঁছে পেটানোর দাগ তুলে নেওয়া হয়। নিহান হল লোহার গোল মত উঁচু যন্ত্র যার ওপরে কাঁসার পাত্র রেখে কাজ করা হয়। এই কাজ হল মুর্শিদাবাদের সাবেকী ঘরানার কাজ — এই কাজকে বলে পেটাই এর কাজ। আগে ছাঁচ তৈরী করে নিয়ে তরল কাঁসা ঐ ছাঁচে ঢেলে প্রাথমিক আকৃতি তৈরী করে নিয়ে তারপর পেটাই করলে ঐ কাজকে বলা হয় ঢালাই এর কাজ।

এই শিল্পে পেটানোর জন্য ৮/১০ রকমের হাতুড়ী, চার রকমের শাবল (লকী শাবল, গোল শাবল, বাটী তৈরীর জন্য বেকী শাবল ও তিনমুখী শাবল), ১১ রকমের নেহালী (চাঁছার যন্ত্র), ২০ থেকে ২৫ রকমের সাঁড়াশী, হাতে তৈরী করা কম্পাস, নিহান, তাছাড়া পালিশ করার জন্য কুঁদ বা কোন্দ। এখন অবশ্য পালিশের কাজ অনেকেই বিদ্যুৎচালিত মেশিনে করেন। ১৯৯২ সালের মূল্যস্তরে ঐ যন্ত্রপাতিগুলির আনুমানিক মূল্য ছিল ৫০০ টাকার কিছু বেশী। পিতলের কাজেও এই একই যন্ত্রপাতি লাগে তবে আকৃতি অপে(াকৃত বড় হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া কাঁসা পিতলের ইউনিটগুলোতে অনেকেই উনুনের আঁচ বাড়ানোর জন্য ব্লোয়ার ব্যবহার করেন, এছাড়া বিদ্যুৎচালিত মোটর, হ্যান্ডবল প্রেস, বিদ্যুৎচালিত রোলার মেশিন, ড্রিলিং মেশিন, পালিশের মেশিন প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করলে অনেক কম সময়ে অনেক বেশী পরিমাণ দ্রব্য তৈরী করা যায়। কিন্তু এগুলো কেনার মতো সামর্থ্য অধিকাংশ দরিদ্র কারিগরেরই নেই।

কাঁসা শিল্পের একটি শৈল্পিক দিক রয়েছে। এটি আলোচনা করতে গেলে কি কি দ্রব্য কাঁসা পিতলে তৈরী হয় তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাঁসার পরিচিত দ্রব্য হল থালা, বাটি, গেলাস, এবং বিভিন্ন আকৃতির ডিশ, ডিশের উপর বিভিন্ন প্রতিকৃতি।

প্রথমে কাঁসার থালার প্রসঙ্গে আসা যাক। কাঁধা উঁচু থালা যেগুলো এখন বহুল প্রচলিত, সেগুলোকে কটকী, লতা, ছেচা, রাজভোগ, ভুবনে(রী, গয়ে(রী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। মুর্শিদাবাদের প্রখ্যাত বগীথালা ৫ রকমের — ১) পে-ন, ২) গ্যাস, ৩) ডবল গ্যাস, ৪) সর্বসুন্দরী গ্যাস, ৫) দুরোখা বগি।

ডবল গ্যাস থালাগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হবে একাধিক থালা, সর্বসুন্দরী গ্যাসের (ে ত্রে থালাটি রেখে দিলে মনে হবে মাঝখানে একটি পে-ট বা ডিশ আছে। মাঝখানটা অত্যন্ত চকচকে ও খুব সুন্দর। দুরোখা বগি থালা দুদিক থেকে একই রকম। তলাটাও একই রকম ছিলা কাটা। বর্তমানে অবশ্য শুধু পে-ন থালাই তৈরী হয়। গ-াসও নানারকম— সরফুলি (গ্যাস), গয়া (পে-ন), ঢাকনা দেওয়া (সরপোষ) গ-াস, গামছা মোড়া গ-াস, আনারস গ-াস, তেথাকি গ-াস, জল সন্দেশ গ-াস, জামাই ঠকানো গ-াস ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে ধুতুরা ফুল গ-াস, টমলেট গ-াস, সানাই গ-াস। প্রতিটি গ-াসের নামের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। তেথাকি গ-াস এমনভাবে তৈরী যে বিশেষ ধরনের তিনটি আকৃতির থাক নিয়ে গ-াসটি উঠেছে। জামাই ঠকানো গ-াস এর মধ্যে তিনটি স্তর, প্রত্যেকটিতে আলাদা খাবার রাখা যাবে, প্রথম স্তরে হয়ত জল আছে, সেটি তুলে নিলে দ্বিতীয় স্তরে হয়ত সন্দেশ, ঐ স্তরটি তুলে নিলে হয়ত তৃতীয় স্তরে নুন বা এমন কিছু রাখা যাবে যা জামাইকে বিভ্রান্ত করবে। এই গ-াসের ওজন ১ কেজি ১০০ গ্রাম। টমলেট গ-াস তলার দিকে স(থেকে ওপরে চওড়া। বর্তমানে পে-ন, গামছা মোড়া, তেথাকি, জামাই ঠকানো সবরকম গ-াসই ঢালাই এ হতে পারে। কিন্তু টমলেট, ধুতরা ফুল এবং সানাই গ-াস বর্তমানে একেবারে হয় না কেননা এগুলি ঢালাই-এ সম্ভব নয়।

পূর্বে কাঁসার পানের ডাব্বা, গাড়ু, কাঁসার গামলা, সরা, পিকদানী তৈরী হত। বর্তমানে কাঁসার ওয়াল পে-ট, জাহানা (ওয়াল পে-টের মধ্যে একটি বিশেষ ডিজাইন), আঙ্গুর পাতা, পেঁপে পাতা, বেল পাতা, শঙ্খ, মাছ, হাঁস, বক, কাক, ময়ূর প্রভৃতি তৈরী হয়। কাঁসার ডিশের ওপর বিভিন্ন চিত্র, শিল্প কাজ খোদাই করা হয়। এসব কাজে বিশেষজ্ঞ শিল্পীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। ভবশঙ্কর দাঁ ছিলেন খুব উঁচু দরের শিল্পী, ইনি আঙ্গুর পাতা, পেঁপে পাতা, তুঁত পাতা তৈরীতে অসাধারণ দ(ছিলেন। ইনিই ১৯৮৮ সালে প্রথম রাজ্য সরকারের পুরস্কার পান। হাসপাতালে থাকাকালীন এই শিল্পী এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। দারিদ্রের নিদা(ণ আঘাতে, চিকিৎসার অভাবে এই প্রতিভাবান শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে। তেঁতুল দত্ত ১৯৯১-৯২ সালে কাঁসার ডিশের ওপর বিবেকানন্দ তৈরীর জন্য রাজ্য সরকারের দ্বিতীয় পুরস্কার পান। ১৯৯২-৯৩ সালে কাঁসার ডিশের ওপর ভারতমাতা তৈরীর জন্য বিশেষ পুরস্কার, ১৯৯৮-৯৯ সালে একটি কাঁসার ডিশের ওপর কাজী নজ(ল ইসলামের প্রতিকৃতি তৈরীর জন্য রাজ্য সরকারের পুরস্কার এবং ১৯৯৯-২০০০ এ বাটি তৈরীর জন্য গৌর রাজবংশী জেলাস্তরে পুরষ্কার পান।

কাঁসা শিল্পের একটি শৈল্পিক দিক আছে, প্রতিটি বাসন তৈরীতে একটা বিশেষ চিন্তাভাবনা, একটা বিশেষ শিল্প শৈলী পরিল(ত হয়। তাই এর ব্যবহারিক মূল্যের পাশাপাশি শিল্পগত মূল্য বিশেষ স্বীকৃতির দাবী রাখে।

পিতলের সাহায্যেও থালা, বাটি, গেলাস, সরা, বালতি, গামলা, ডাবর, ঘড়া প্রভৃতি তৈরী হয়। পিতলের নানা ওয়াল পে-ট, সৌখিন দ্রব্য গোল্ডেন শীট দিয়ে সিংহাসন, পাল তোলা নৌকা, ওয়াল পে-ট প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে বিভিন্ন কাঁসা পিতলের দোকানে যে পিতলের ফুলদানী, ধুপদানী, মোমদানী দেখা যায় সেগুলো সবই মোরাদাবাদ, জয়পুরে তৈরী। মুর্শিদাবাদে এই ধরনের কোন কাজ হয় না।

গেলাস, বাটি ও থালার দাম ১৯৬৬ সালের তুলনায় ২০০১ সালে ১৩ থেকে ১৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৯২ সালের

তুলনায় থালা, বাটি, গেলাসের দাম প্রায় ১.৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পিতলের ে(ত্রে থালার দাম হল ১৫০ টাকা কেজি, পিতলের ঘড়ার দাম ১৭০ টাকা কেজি, বালতি, গামলা, ডাবর, ঘড়ার দাম হল ১৪০ টাকা কেজি।

কারিগরদের ে(ত্রে যারা দ(কারিগর তাদের মজুরী কিছু বেশী। ১৯৯২ সালে দ(শিল্পীরা ১২ ঘণ্টা কাজ করে দিনে ৫০ টাকা, অর্ধ-দ(কারিগরেরা ২০ থেকে ২৫ টাকা রোজগার করতে পারতেন। দ(কারিগরেরা, যাদের নিজস্ব ইউনিট আছে মহাজনদের কাছ থেকে খুঁট (ভাঙা কাঁসা) সংগ্রহ করেন এবং ঐ খুঁট গলিয়ে জিনিস তৈরী করে মহাজনকে ফেরৎ দেন, পরিবর্তে মজুরী পান। এই শিল্পীদের মজুরী-কারিগর বলা যেতে পারে। এরা বিভিন্ন দ্রব্যের ে(ত্রে বিভিন্ন মজুরী পেয়ে থাকেন। ১৯৯২ সালে কাঁসারীপাড়ার একজন দ(শিল্পী কাঁসার থালা, বাটি, গেলাস তৈরীর জন্য কেজিতে ৪০টাকা, পিতলের ে(ত্রে ৩৫টাকা মজুরী পেতেন। কান্দীর একজন দ(কারিগরের এই মজুরী ছিল ৩৫-৩৬ টাকা। প্রায় সব কারিগরই এই মজুরীর ওপরে প্রতি কেজি শিল্পদ্রব্যের জন্য ১ কেজি ৩০ গ্রাম খুঁট পেয়ে থাকেন, যে খুঁট দিয়ে এরা পরবর্তী কালে দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করেন। বেশকিছু সাধারণ কারিগর আছেন যারা শুধু তৈরী দ্রব্যগুলি পালিশ করেন। এরা বাটির ে(ত্রে কেজিতে ৬ টাকা এবং গেলাস ও থালার ে(ত্রে ৪ টাকা করে পেতেন। ২০০১ সালের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বিশুদ্ধ কাঁসার গেলাসের ে(ত্রে প্রতি কিলোতে মজুরী ১০০ টাকা, ভরণের গেলাসের ে(ত্রে মজুরী প্রতি কিলোতে ৬০ টাকা, ২ নং কাঁসা (মেটাল) এর গেলাসের ে(ত্রে মজুরী প্রতি কিলোতে ৫০টাকা। বিশুদ্ধ কাঁসার বাটির ে(ত্রে মজুরী প্রতি কিলোতে ৭০ টাকা, ভরণের এবং ২ নং কাঁসা (মেটাল) এর ে(ত্রে মজুরী প্রতি কিলোতে ৪০ টাকা, বিশুদ্ধ কাঁসার থালার ে(ত্রে মজুরী প্রতি কিলোতে ৮০ টাকা, ২ নং কাঁসার থালার ে(ত্রে মজুরী প্রতি কিলোতে ৬০ টাকা। কাঁসার এই দ্রব্যগুলির কোনটিই কোন একজন কারিগর এককভাবে তৈরী করতে পারেন না, কয়েকজন মিলে তৈরী করেন। একজন দ(কারিগর তাঁর ইউনিটে আরো পাঁচজনের সহায়তায় দিনে ৭-৮ কেজি কাজ করতে পারেন। কারিগরেরা সাধারণতঃ ১২ ঘণ্টা কাজ করে থাকেন। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় একজন দ(কারিগর ১২ ঘণ্টা কাজ করে দিনে গড়ে ৯০-১০০ টাকা রোজগার করতে পারেন। অর্ধ-দ(কারিগর ৪৫-৫০ টাকা রোজগার করতে পারে। পালিশের কাজের মজুরী ১ কেজিতে ১৫ টাকা। একজন দিনে সর্বোচ্চ ৬ কেজি কাজ করতে পারেন, অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা অবিরত পরিশ্রম করলে ৯০ টাকা উপার্জন করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অধিকাংশ কারিগরের মাসের মধ্যে সবদিন কাজ থাকে না। বাজার মন্দার সময় মাসের ১৫ দিন কাজ হয়। মরশুমেও ২৫ দিনের বেশী কাজ সাধারণত হয় না। যে মাসে সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কম থাকে সে মাসে কাজও কম থাকে। প্রচণ্ড গরমে কাঁসা গলানোর কাজ করা সম্ভব নয়, তাই গরমে কাঁসা গলানোর কারিগরেরা সপ্তাহে ৩ দিনের বেশী কাজ করতে পারেন না। কোন মহিলা কারিগর এই শিল্পে নিযুক্ত(নেই।

কাঁসার দ্রব্য বিত্র(য়ের মাধ্যম হলেন প্রধানতঃ স্থানীয় মহাজনেরা। এদের মধ্যে অনেকে কলকাতা গিয়ে শিল্পদ্রব্য বিত্র(ী করে আসেন। মুর্শিদাবাদে এখন কিছু ব্যক্তি(এই শিল্প ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন যাঁরা এখানকার শিল্প দ্রব্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান এবং রাণীগঞ্জ, নবদ্বীপ প্রভৃতি জায়গা থেকে সেখানকার শিল্প দ্রব্য মুর্শিদাবাদের ছোট ছোট শহরে নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন কান্দীর তৈরী বিভিন্ন ধরণের থালা খাগড়ার বাসন হিসাবে বাইরে বিত্র(ী হয়ে থাকে।

বহরমপুরে কাদাই, গোরাবাজার, খাগড়া, চুঁয়াপুর, স্বর্ণময়ী বাজার প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় ৩০-৩৫টি দোকান আছে। কান্দীতেও ১০টি দোকান রয়েছে। পূর্বে কারিগরের সংখ্যা ছিল বেশী কিন্তু দোকানের সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় বেশী ছিল না। তাই বর্তমানে কাঁসা-পিতলের দ্রব্যের ব্যবসা একেবারে লাভজনক নয় একথা বলা চলে না, যদিও কারিগরদের অবস্থার কোন অগ্রগতি ঘটেনি।

সরকারী সাহায্য সম্পর্কে কারিগর শিল্পীদের মধ্যে ে(াভ রয়েছে। প্রকৃত শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারের প(থেকে যে পুরষ্কার প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে দরিদ্র ও অজ্ঞ শিল্পীরা সে সুযোগও অনেক ে(ত্রে গ্রহণ করতে স(ম হন নি।

মুর্শিদাবাদের কাঁসা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কতগুলো বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করা(কারণ, বৈধ যোগান বৃদ্ধি ছাড়া কোন শিল্প যথাযথ ভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ শিল্পের সাবেকী ঘরানার অনেক কাজই আজ হারিয়ে গেছে, আবার নতুন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক দ্রব্য সামগ্রী তৈরী হচ্ছে না। অর্থাৎ গতানুগতিক বাসন-কোসনের পাশাপাশি সৌখিন দ্রব্য, নানা কা(কার্য করা ডিশ, উপহার সামগ্রীর উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এখানকার শিল্পীরা যদি তাদের দ(তার একটা অংশ এসব কাজে ব্যবহার করেন তবে সৃষ্টি হতে পারে অনন্যসাধারণ শিল্পসম্ভার। তৃতীয়তঃ কাঁসা শিল্পে কিছুটা যন্ত্রীকরণের সুযোগ

সারণী- ৮.৬
কাঁসার বাসনের দামের তুলনামূলক চিত্র
(দাম প্রতি কেজি)

দ্রব্য	১৯৬৬	১৯৮৫	১৯৯২	২০০১
গেলাস (কাঁসা)	২৪.০০	১৪৫.০০	২৩০.০০	৩২৫.০০
গেলাস (ভরণ)	—	—	১৫০.০০	১৮০.০০
বাটি (কাঁসা)	২৩.০০	১৪২.০০	১৯০.০০ - ২০০.০০	৩২৫
বাটি (পেটাই)	—	—	২১৫.০০ - ২৩৫.০০	—
থালা (কাঁসা)	২২.০০	১৩০.০০	২২৫.০০ - ২৩০.০০ (দুদিক পালিশের ক্ষেত্রে)	৩২৫.০০ (দুদিক পালিশ)
থালা (কাঁসা)	—	—	২১৫.০০ - ২২০.০০ (এক দিক পালিশের ক্ষেত্রে)	৩১৫.০০ (একদিক পালিশ)

রয়েছে, কিন্তু অর্থাভাবে শিল্পীরা এগুলো ব্যবহার করতে পারে না। শিল্পীদের এইসব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে সাহায্য করা যেতে পারে। ব্যাঙ্কগুলি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। চতুর্থতঃ এই শিল্পে কারিগরদের মজুরী কোন কোন ক্ষেত্রে দিনমজুরদের আয়ের থেকেও কম, বর্তমানে মুর্শিদাবাদে দিনমজুরদের আয় দৈনিক ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকা, তাই অনেক শিল্পী এই শিল্প থেকে সরে আসছেন। শিল্প প্রতিভার এই অপচয় দুঃখজনক। পঞ্চমতঃ শিল্পটি সম্পূর্ণরূপে মহাজনদের কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শিল্পী সমবায় গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন, অবশ্য যদি শিল্পীদের নিকট কাঁচামালের যোগান সুনিশ্চিত করা যায় তবেই পরবর্তী ধাপ হিসাবে এটা সম্ভব।

কাঁসা শিল্পের ওপর সমগ্র মুর্শিদাবাদের এখনও প্রায় ৫-৬ হাজার মানুষ নির্ভর করে রয়েছেন। শিল্পটি পুনর্গঠিত করতে পারলে আরো কিছু মানুষের কর্ম-নিযুক্তির ব্যবস্থা হতে পারে। কাঁসা পিতলের পুনর্বিক্রয়মূল্য রয়েছে বলে সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গ্রামের মানুষেরা কাঁসা পিতলের জিনিসপত্র কিনতে উৎসাহী থাকে। কাঁসার বাসন বেশী স্বাস্থ্যসম্মত বলে অনেকে মনে করেন, তাছাড়া কাঁসা অস্থাবর সম্পত্তিও বটে। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার দেবার ক্ষেত্রে কাঁসার দ্রব্যের বিশেষ চাহিদা রয়েছে, এ চাহিদা বাড়ানোর সুযোগও রয়েছে। এমতাবস্থায় মুর্শিদাবাদের এই শিল্পটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, শিল্পপ্রেমী এ জেলার প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। কাঁসার দ্রব্যের দাম কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে সারণী- ৮.৬ এ।

অলঙ্কার শিল্প

একদা বহরমপুরের সোনাপট্টির অলঙ্কারের বাজারের নাম ছিল কলকাতার পরেই। আজ আর জেলার অলঙ্কার শিল্পের সেই সুদিন নেই। রাজা রাজড়াদের দিন ফুরোনোর সাথে সাথে অলঙ্কার শিল্পেও এসেছে মন্দা। টাকার অঙ্কে ব্যবসার পরিমাণ আজ অনেক বেশী কিন্তু সোনাপট্টি বাজারের সেই কর্মচঞ্চলতা আজ উধাও। কোনরকমে ধুকিয়ে ধুকিয়ে চলছে এই শিল্প।

অলঙ্কার শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন দু ধরণের মানুষ। এদের একদল স্বর্ণব্যবসায়ী আর একদল হলেন স্বর্ণশিল্পী। একসময় স্বর্ণব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ছিলেন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মানুষ। নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ (১৩১৮) থেকে জানা যায় সুবর্ণ বণিকদের আদি বাসস্থান ছিল অযোধ্যার নিকট রামগড়ে। রাজা আদিশূরের আমলে সুবর্ণবণিকদের পূর্বপুরুষেরা বাংলায় চলে আসেন। স্বর্ণদ্রব্যের ব্যবসা করতেন বলে আদিশূর এদের সুবর্ণবণিক আখ্যা দেন। অনেক ঐতিহাসিক আদিশূরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখেরা আদিশূরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। বর্তমানে জেলার স্বর্ণব্যবসায়ীদের শতকরা ৫৫-৬০ ভাগ মানুষ সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ভুক্ত। স্বর্ণশিল্পীদের মধ্যে

সব সম্প্রদায়ের মানুষই রয়েছেন এবং এটি মোটামুটি ভাবে পারিবারিক ব্যবসা। বংশানুত্র(মিক ভাবেই স্বর্ণশিল্পীদের ছেলেরা এই শিল্পে যুক্ত(হন। স্বর্ণশিল্পীদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে বলে নেহাৎ কিশোর বয়স থেকে পরিবারের ছেলেরা ধীরে ধীরে এই পেশায় যুক্ত(হয়ে পড়েএবং বয়সকালে দ(শিল্পীতে পরিণত হয়।

জেলার স্বর্ণশিল্পের কাঁচামালের যোগান আসে কলকাতা থেকে। বড় স্বর্ণব্যবসায়ীরা পাকা সোনা কিনে আনেন এবং তাতে খাদ মিশিয়ে গহনার সোনা তৈরী করেন । ২৪ ক্যারেট সোনায় খাদ মিশিয়ে ২২ ক্যারেট করা হয়। খাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তামা বা চাঁদি । স্বর্ণব্যবসায়ীরা খরিদ্দারদের কাছ থেকে গহনার অর্ডার নিয়ে সেই মতো গহনার সোনা দেন স্বর্ণশিল্পীকে ।

বিশিষ্ট এবং দ(স্বর্ণশিল্পীকে বলা হয় 'গরিত' । এই গরিত হলেন গহনা তৈরীর প্রধান কারিগর। তাঁর অধীনে থাকেন অলঙ্কার তৈরীর নানা বিভাগে দ(ও অদ(কারিগরেরা ।এদের মধ্যে ছেলাই-এর কাজ করেন ছেলাইবালা ,নকশার কাজ করেন নকশাবালা, পাথর সেটিং করেন সেটিংবালা , মীনার কাজ করেন মীনাবালা ।এছাড়াও থাকেন ঠোকাই কারিগর , কাটাই কারিগর , গুলি দানা বা বলের কারিগর । ঠোকাই কারিগর ডাইসে ঠুকে গহনার কাঙ্খিত চেহারা আনেন আর কাটাই কারিগর কাট ছাট করে গহনার চুড়ান্ত রূপ দেন। আর যেসব গহনায় বল - এর প্রয়োজন হয় (যেমন হার বা কানপাশা) সেখানে গুলিদানা বা বলের কারিগরকেও হাত লাগাতে হয়। এছাড়াও থাকে ফটো পেস্টিং - এর কাজ । অলঙ্কার বা মীনার কাজে ফটো পেস্টিং করতে হলে প্রয়োজন হয় এদের।

স্বর্ণব্যবসায়ীরা পাকা সোনা কিনে এনে মুচিতে তা গলান। প্রয়োজনমত খাদ মিশিয়ে গহনার সোনা তৈরী করে তা দেওয়া হয় গরিতকে । একপর গরিত গহনা তৈরীর বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীদের দিয়ে তৈরী করেন গহনা । স্বর্ণব্যবসায়ীরা গরিতকে শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় সোনাটুকু দেন। গহনা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি সমস্তই দিতে হয় কারিগরদের। গহনা তৈরীর কাজে বহু ছোট বড় যন্ত্রপাতি লাগে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল হাপর, চৌকি, হাতুড়ি , প-াস, কাটারি, চিমটা , বাক্নল, গ্যাসপ্রদীপ ইত্যাদি। রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে সোনা গলানোর জন্য লাগে মোম, সোরা আর সোহাগা। গুঁড়ো জমা করার জন্য দরকার সোডার । ছেলাই এর জন্য দরকার হয় গালার । দু'ধরণের গালা এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়-- ধূপ গালা আর চাচ গলা । অলঙ্কার শিল্পে দু'ধরণের ডাইস প্রয়োজন হয়। যে সব কাজে ঠোকার দরকার হয় মূলত সেসব কাজে ব্যবহার করা কাঁসার ডাইস । অন্য সব কাজে ব্যবহার করা হয় লোহার ডাইস। ইদানীং কিছু কাজে প-াস্টার-এর ব্যবহার হচ্ছে।

কিছু গহনায় পান দিতে হয়। দুধরণের পান দেওয়া হয় গহনায়। বাংলা পান আর কেডিয়াম পান। বাংলা পানের খরচ কম। চাঁদি, দস্তা আর তামার সাহায্যে বাংলা পান দেওয়া হয়। কেডিয়াম দিয়ে কেডিয়াম পান দেওয়া হয়।

বাংলা পান দেওয়া গহনা ভেঙ্গে নতুন গহনা করতে গেলে তাতে সোনার পরিমাণ কমে যায় অন্যদিকে কেডিয়াম পান দেওয়া গহনায় সোনার পরিমাণ একই থাকে । গহনা বিত্রি(বা ভেঙ্গে নতুন গহনা করতে গেলে গ্রাহক কম (তিগ্রস্থ হন। গহনার জন্য প্রতি গ্রাম সোনা পিছু ৬০ টাকা বানী নিয়ে থাকেন অর্থাৎ বাংলা পান দেওয়া ১০ গ্রাম সোনার গহনার মজুরী ৬০০ টাকা অন্যদিকে কেডিয়াম পান দেওয়া গহনার ে(ত্রে ঐ মজুরী ১২০০টাকা।

স্বর্ণব্যবসায়ীরা ত্রে(তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে বানী নিলেও স্বর্ণশিল্পীদের এরকম কোন বাঁধাধরা মজুরী নেই। যেহেতু তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করেন সেহেতু তাদের বাঁধা মাইনেও নেই । স্বর্ণব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তারা গহনা অনুযায়ী মজুরী পেয়ে থাকেন। একজন দ(কারিগর দিনে আট ঘন্টা পরিশ্রম করলে মাসে তিন চারহাজার টাকা রোজগার করতে পারেন। অদ(শ্রমিকের মাসিক রোজগার দু থেকে আড়াই হাজার টাকা।

১৯৬৩ সালের ৯ই জানুয়ারী ভারত চীন যুদ্ধের পটভূমিতে চালু হওয়া স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে ১৪ ক্যারেট সোনার গহনা তৈরীর যে বিধি চালু হয়েছিল তার ফলে এই শিল্পটি জোর ধাক্কা খায়। ঐ আইনানুযায়ী ১৪ ক্যারেটের বেশী সোনার গহনা তৈরী ছিল আইনত দন্ডনীয়। সাধারণ মানুষ সোনার গহনার প্রতি বিমুখ হলে বহু স্বর্ণশিল্পী পেশাচ্যুত হন। কেউ কেউ অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যাও করেন। মুর্শিদাবাদেও আত্মহত্যা করেন দু'জন স্বর্ণশিল্পী।

পরবর্তীকালে ভি. পি. সিং-এর অর্থমন্ত্রী মধু দন্ডবতে এই নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে অবস্থা খানিকটা স্বাভাবিক হয়। বর্তমানে এই শিল্পের সামনে অন্য সঙ্কট হাজির হয়েছে। এখন অত্যাধুনিক মেশিনে, অল্প সোনায় হালফ্যাসানের গহনা তৈরী হচ্ছে। এর ফলে সাবেকী ভারী গহনার কদর কমছে। কাজ কমছে স্বর্ণশিল্পীদের। একটি ছেলাই মেশিন কাজ কেড়ে নিচ্ছে তিন চারজন ছেলাই মিস্ত্রীর। শিল্পীদের সেই আর্থিক (মতা নেই যে তারা মেসিন কিনে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবেন। সব মিলিয়ে এই শিল্পটি এখন এক ত্র(ান্তিকালের মধ্যে দিয়ে চলছে। শিল্পের সুদিন ফিরবে কিনা তা বলতে পারে একমাত্র ভবিষ্যতই।

শঙ্খ শিল্প

জেলায় শঙ্খশিল্প কেন্দ্রীভূত হয়েছে মূলত তিনটি গ্রামে। ডোমকলের জিৎপুর , বাজিতপুর আর ভরতপুরের আমলাই গ্রামে । এই তিনটি গ্রামের শঙ্খশিল্পীরা পু(ষানুক্র(মিক ভাবে তৈরী করে আসছেন হাতের শাঁখা, আংটি , ব্রেসলেট, মালা, বাদ্যশঙ্খ , জলশঙ্খ , ইত্যাদি । তবে জেলার শঙ্খশিল্পীদের সবচেয়ে পুরাতন বসতি জিৎপুর । সেখান থেকেই এরা ছড়িয়ে পড়েছেন বিভিন্ন জায়গায়।

এই শিল্পের কাঁচামাল শঙ্খ। শঙ্খ হল শক্ত(খোলসযুক্ত(একধরণের সামুদ্রিক প্রাণী। এই কাঁচামালের যোগান আসে চেন্নাই শ্রীলঙ্কা, আন্দামান, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি জায়গা থেকে । শঙ্খশিল্পীরা সমবায় বা মহাজনদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে শাঁখের করাত দিয়ে কেটে প্রথমে শঙ্খবলয় বের করে নেন । একটা বড় শঙ্খ থেকে দশ - বারোটি বলয় পাওয়া যায় । ছোট বা মাঝারি শঙ্খ থেকে দুই থেকে সাত-আটটি পর্যন্ত বলয় পাওয়া যায়। আগে শিল্পীরা নিজেরাই হস্তচালিত যন্ত্রে এই বলয় কেটে নিতেন। এখন বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা বিদ্যুতচালিত যন্ত্র বসিয়েছে। ছোট শিল্পীরা সেই সব মেসিনে শঙ্খ কেটে নেন । এর পর বলয়গুলো শিলে ঘষে সমান করা হয়। এরপর ন(ণ ও বাটালির সাহায্যে শিল্পীরা সেই শাঁখার ওপর নক্সা ফুটিয়ে তোলেন। জলে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে সেই জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় শঙ্খবলয়গুলিকে। এরপর শাঁখাগুলিকে পালিশ করা হয়। দেওয়া হয় রং। শাঁখার মনোহারিত্ব আনতে শিল্পীরা ব্যবহার করেন গালা , নক্সার মাঝে মাঝে লাল , নীল সবুজ রং - এর ছোঁয়াচ দেন। এভাবেই তৈরী হয় বিবাহিত হিন্দু নারীর অঙ্গভূষণ শাঁখা।

শঙ্খশিল্পীরা শাঁখা ছাড়াও অন্যান্য জিনিস তৈরী করে থাকেন। কেউ কেউ শঙ্খের উপর ন(ণ দিয়ে খোদাই করে ছবি আঁকেন। অসাধারণ পটুত্বে আঁকা সেই সব শিল্পকর্মগুলি শিল্পরসিকদের আদরের বস্তু । আগে শঙ্খশিল্পীরাই গ্রামে গ্রামে শাঁখা ফেরী করতেন। 'সিধে' নিয়ে মা বোনেদের হাতে পরিয়ে আসতেন শাঁখা। হিন্দুবাড়ীর অন্দরমহলে শাঁখারীদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। দরাজ হাতে মা বোনেরা সিধে দিতেন শাঁখারীদের। শাঁখারীরাও খরিদ্দারের স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা করে ভক্তি(ভরে পরিয়ে দিতেন শাঁখা ।

এখন আধুনিক শি(িত সমাজে শাঁখার কদর কমছে। হিন্দু ঘরের অনেক শি(িত সধবা মহিলা এখন আর শাঁখা পরাকে অবশ্যিক মনে করেন না। ফলে কমছে চাহিদা । কাঁচামালের দাম বাড়ায় বাড়ছে শাঁখার দামও । অনেকেই ঝুঁকছেন কমদামী প্লাস্টিকের তৈরী শাঁখার দিকে । ফলে দুর্দশা বাড়ছে শঙ্খশিল্পীদের আর লাভ বাড়ছে ফড়ে মহাজন বা বিক্রে(তাদের মতো মধ্যস্বত্বভোগীদের।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন দপ্তর সমুদ্র থেকে শঙ্খ উত্তোলন ও বিক্রি(র উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে । এর ফলে সারা দেশের অসংখ্য শঙ্খশিল্পীর (জি রোজগার বন্ধ হওয়ার যোগাড় হয়। বিভিন্ন মহল থেকে ঐ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিশদ আলোচনার পর ৫ই ডিসেম্বর (২০০১) পুনরায় একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। এর ফলে শঙ্খশিল্পের সাময়িক সঙ্কট দূর হয়েছে।

দা(শিল্প

মানব সভ্যতার সূচনা হয় আগুন আবিষ্কারের হাত ধরে। আর সেই সভ্যতা বেগবান হয় চাকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। বলা বাহুল্যমাত্র, সেই চাকা ছিল দা(নির্মিত । কাজেই এ কথা বললে অত্যুক্তি(হয়না দা(শিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন, তার বয়স মানব সভ্যতার বয়সের কাছাকাছি।

নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে দা(শিল্পের সূচনা হলেও মানুষের নান্দনিক চেতনা তাকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে । তাই নিতান্ত প্রয়োজনের কাঠের আসবাবও কখনো কখনো শিল্পদ্রব্য হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে দেখবার সামগ্রী । শিল্পের জয় সেখানেই।

দা(শিল্পের দুটি দিক আছে. একটি ব্যবহারিক দিক, অন্যটি নান্দনিক দিক। প্রথমটির উদাহরণ প্রয়োজনের তাগিদে তৈরী কাঠের দ্রব্যাদি । এতে একদিকে যেমন প্রয়োজন মেটে তেমনি অন্যদিকে হতে পারে নান্দনিক চেতনার প্রকাশও। দ্বিতীয় দিকটি শুধুই নান্দনিক চেতনার দিক । শিল্পী তার মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরী করেন কাঠের তৈরী সৌখিন শিল্পদ্রব্য - যার ব্যবহারিক মূল্য নাও থাকতে পারে কিন্তু শিল্পমূল্য যথেষ্ট।

জেলায় দা(শিল্পের দুটি ধারাই বিদ্যমান। সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার আছে। গৃহস্থালীর নানা কাজে কাঠের সাজ সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। কাঠের তৈরী দরজা , জানালা , চেয়ার , টেবিল, খাট পালঙ্ক, চৌকি, তক্ত(াপোশ ছাড়াও গ্রামীণ জীবনে কাঠের আরো অনেক ব্যবহার ল(্য করা যায় । কৃষি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহৃত হয় কাঠের তৈরী লাঙল আর নাঙলে (বিদে)। এদের ফলা বা ফাল অবশ্য লোহার। নিড়ানি , কোদাল বা কাটারির হাতল হিসাবে কাঠের ব্যবহার আছে। অনেক সময়ই এই হাতলগুলোকে ছোট বাটালি বা ন(ণ দিয়ে কুঁদে অপরূপ করে তোলা হয়। গ্রামাঞ্চলের কোথাও

কোথাও এখনো ঢেঁকির ব্যবহার প্রচলিত আছে। রান্নাঘরেও কাঠের সরঞ্জামের কোন অভাব নেই। লবণ রাখার লবণদানি, গাছা (যার উপরে লম্ফ বা প্রদীপ রাখা হয়) , ডাল ঘুঁটবার সড়কি , (টি বেলার চাকতা বেলুন বা বসবার পিঁড়ি সবই কাঠের তৈরী । এগুলো যেমন নিতান্ত আটপৌরে চেহারায় পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় জমকালো চেহারায়ও। তখন সেগুলি হয়ে ওঠে অপরূপ শিল্পকলার নিদর্শন।

জেলায় পরিবহণের কাজে এখনও গ(র গাড়ী বা ঘোড়ার ব্যবহার আছে, একদা ল্যান্ডো ফিটন, ফিয়েট , এক্কা , ছ্যাকরা নানা নামের নানা ধরণের ঘোড়ার গাড়ী তৈরী হ'ত। জনৈক রাখাল মিস্ত্রী ছিলেন এসব গাড়ী তৈরীর ব্যাপারে সবচেয়ে নামজাদা শিল্পী । এখন অবশ্য টমটম নামে সুপরিচিত একধরণের ঘোড়ার গাড়ীই জেলায় দেখা যায় । গ(র গাড়ীর (ত্রে কাঠ ও বাঁশের মিলিত ব্যবহার ল(্য করা যায়। গ(র গাড়ীর চাকা তৈরী এক নিপুন শিল্পকর্ম। মোট ৩১ টি ছোট ছোট অংশ জুড়ে তৈরী হয় এই চাকা । এগুলি হ'ল লাহা একটি , বেলি দুটি, আরা চারটি , পুঁটি ছয়টি , পচরা বারোটি আর চুল ছয়টি। এই সব শিল্পীদের জ্যামিতির জ্ঞান দেখলে অবাক হতে হয়। তবে এই ধরণের গ(র গাড়ীর চাকা মূলত বাগড়ীতেই প্রচলিত। রাঢ় অঞ্চলে বেশীরভাগ (ত্রেই লোহার চাকা ব্যবহৃতহয়। বাগড়ীর নানা জায়গার দ(ছুতার মিস্ত্রীরা গ(র গাড়ীর চাকা তৈরী করেন। তবে এ(ত্রে উল্লেখযোগ্য হরিহরপাড়ার ডল্টনপুর সংলগ্ন 'কারখানা' এলাকাটি। ছুতোর মিস্ত্রীদের আধিক্যে জায়গাটির নামই হয়ে গেছে কারখানা।

জেলার দা(শিল্পীরা নানা ধরণের নৌকা ছিপ, ভাউলিয়া, পানসী বজরা প্রভৃতি তৈরীতেও তাঁদের মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। মকরমুখী, হংসমুখী, সাগরদাঁড়ী , ময়ূরপঙ্খী, মোহসুন্দর, পুলারখোসা, লোলডিঙ্গি, হাতিমর্দন রংমহাল প্রভৃতি বিচিত্র নামের নৌকাগুলি তাদের নামের মতোই বিভিন্ন রকম দেখতে ছিল। অখ্যাত, অজ্ঞাত দা(শিল্পীরা তাদের অক্লান্ত শ্রম দিয়ে তৈরী করতেন এসব জলযান। ছবি ছাড়া এই নিদর্শনগুলো আজ আর দেখতে পাওয়া যাবে না । এখনও তৈরী হয় নৌকা , ডোঙা তবে তাতে প্রয়োজন মেটে, নান্দনিক উৎকর্ষ সেখানে অনুপস্থিত ।

একসময় জেলার নবাব, জমিদার, অভিজাত ব্যক্তি(বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় দা(শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে । তাঁরা শিল্পের কদর বুঝতেন। জেলার বেশ কিছু জমিদার পরিবারে এবং মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের উত্তরাধিকারীদের সংগ্রহে সেই সব চমকপ্রদ শিল্পদ্রব্যের কিছু নমুনা এখনো রয়েছে । উত্তরাধিকারীদের দারিদ্র-হেতু কিছু দ্রব্য আড়কাটিদের হাত ঘুরে বিক্রি(হয়ে গেছে সৌখিন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহকারীদের কাছে। কিছু ঠাঁই পেয়েছে দেশবিদেশের নানা সংগ্রহশালায়।

জেলার বেশ কিছু বিখ্যাত দা(শিল্পীর নাম এখনো বেঁচে আছে কিছু লোকের স্মৃতিতে । বিভূতি মিস্ত্রী , মাধাই মিস্ত্রী, সতীনাথ মিস্ত্রী, শোভান মিস্ত্রী , গদাই মিস্ত্রী, কালু মিস্ত্রী, ফেলু মিস্ত্রী এদেরই কয়েকজন । নবাব ওয়াসেফ আলী মীর্জার বৈবাহিক সৈয়দ মহম্মদ ইব্রাহিম আলি মীর্জা নিজেই ছিলেন একজন দ(কা(শিল্পী । তাঁর হাতের তৈরী বেশ কিছু শিল্পদ্রব্য এখনও বিভিন্ন জনের সংগ্রহে রয়েছে।

জেলার বেশ কিছু পরিবারে এখনও ২০০ - ৩০০ বছরের পুরোনো আসবাব পত্র দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে সিজ্ন করা সেই সব কাঠের আসবাবপত্র আজো নতুন হয়ে আছে। এখন ভাল কাঠের অভাবে এই শিল্পটি ধ্বংস হতে বসেছে । কাঠের দামের জন্য জানালার পাল্লা বানাতে মানুষ এখন ঝুঁকছে কাঁচ আর লোহার দিকে । চেয়ার টেবিল তৈরী হচ্ছে প-াস্টিক দিয়ে। র‍্যাক, আলমারীও তৈরী হচ্ছে লোহা দিয়ে । কাঠের আসবাবপত্র যে তৈরী হচ্ছে না তা নয়, তবে বেশীর ভাগ (ত্রেই ভালো সিজ্ন কাঠের অভাবে সে সব আসবাবপত্র খুব ভালো মজবুত হচ্ছেনা। শৈল্পিক উৎকর্ষও বিরল হয়ে এসেছে।

মজুরীর (ত্রে এই শিল্পের শিল্পীদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল। একজন দ(মিস্ত্রী দিনে ৬ ঘন্টা কাজ করে রোজগার করেন ৯০ -১০০ টাকা । অদ(মিস্ত্রীরা রোজগার করেন ৮০ টাকা। এর বাইরে এরা বিভিন্ন দোকানে ঠিকা কাজ করে থাকেন। সব মিলিয়ে একজন দ(শিল্পীর মাসিক রোজগার ৫-৬ হাজার টাকা । অদ(মিস্ত্রীও মাসে গড়ে চার সাড়ে চার হাজার টাকা রোজগার করেন।

এখন হাতির দাঁতের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই সব হস্ত শিল্পীরা দা(শিল্পের দিকে ঝুঁকেছেন। এরা হাতির দাঁতের বিকল্প হিসাবে চন্দনকাঠের ব্যবহার করে অপরূপ শিল্পসামগ্রী তৈরী করছেন। বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, ইসলামপুরের ভাস্কর পরিবারের শিল্পীরা বর্তমানে এটাকেই পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন । এদের শিল্পের নিদর্শন শুধু রাজ্য বা দেশে নয়, দেশের বাইরেও সমাদৃত । রাজ্য সরকারের সংস্থা মঞ্জুশ্রী এসব শিল্পদ্রব্য বিপণনের দায়িত্ব নিয়েছে । পর্যটকেরা শিল্পনিদর্শন হিসাবে এগুলি কেনেন। মুর্শিদাবাদের দা(শিল্পের এই নতুন ধারাটি অচিরেই ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠবে এমন আশা করা যায়।

শোলাশিল্প

অতি আধুনিক কালে মুর্শিদাবাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হ'ল শোলাশিল্প। শোলা প্রধানত যুক্ত(ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে। প্রতিমার সাজ, বিবাহ অনুষ্ঠানের টোপর, মুকুট প্রভৃতিতে শোলার ব্যবহার হ'ত বহুদিন আগে থেকেই। কিন্তু মুর্শিদাবাদে তথা বাংলার ইতিহাসে রেশম শিল্প, হস্তিদন্ত শিল্প, কাঁসা শিল্প, প্রভৃতির অস্তিত্ব যেমন শিল্প হিসাবে চিহ্নি(ত হয়ে রয়েছে, শোলা শিল্পের (ে ত্রে তা নেই।

১৭০৪ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী বিভাগ ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় বহু শিল্পী মুর্শিদাবাদে চলে আসেন, শোলা শিল্পের (ে ত্রে সে রূপ ঘটেছিল কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যেহেতু মুর্শিদাবাদের শোলাশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি সেহেতু মুর্শিদাবাদের ভগ্ন স্তূপের মধ্যে ইতস্ততঃ বি(িপ্ত কিছু শিল্প সামগ্রী এবং প্রাচীন শিল্পীদের স্মৃতি রোমন্থনের ওপর ভিত্তি করে শোলা শিল্পের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

টোপর, মুকুট, প্রতিমার সাজ ইত্যাদি রচনার মধ্যে প্রধানত শোলাশিল্পের ইতিহাস বিধৃত, কখনো কখনো শোলা দিয়ে কদম ফুল, পাখি, পাল্কী, ঝুলন্ত ঘোড়া ইত্যাদি তৈরী হলেও তার কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। শোলাশিল্পে নিযুক্ত(শিল্পীরা প্রধানত ছিলেন মালাকার। এই শিল্পে নতুন পথের নিশানা নিয়ে আসেন নসীপুর রাজবাড়ীর নিজস্ব শিল্পী বণ্যে(ের মালাকার। যজ্ঞে(ের মালাকার নামে এক শিল্পী দীর্ঘ সময় ধরে নশীপুরের রাজবাড়ীর একটি মডেল তৈরী করেন। অনেকের মতে যজ্ঞে(ের মালাকার বন্যে(েরের অনুজ ছিলেন। মডেলটির শিল্পশৈলী ও পরিমাপ এত নিঁখুত ছিল যে মনে হয় কোন আর্কিটেক্টের সহায়তায় উনি মডেলটি তৈরী করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে মডেলটি লন্ডনে প্রদর্শিত হয় এবং শিল্পী স্বর্ণপদক লাভ করেন। বন্যে(ের মালাকারের সুযোগ্য পুত্র প্রফুল্ল মালাকারও বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এছাড়া প্রতাপ মালাকার, রেনুপদ সরকার, শশধর মালাকার, পূর্ণচন্দ্র মালাকার, কিশোরী মালাকার, যোগেশচন্দ্র কর্মকার প্রভৃতি ছিলেন কিংবদন্তী শিল্পী। এঁদের শিল্পকাজের উৎকর্ষ দেখে মনে হয় শিল্পটি মুর্শিদাবাদে দুশো বছর আগেও ছিল। এ প্রসঙ্গে কান্দীর মুসলমান শিল্পী ওমর আলী শেখের নাম উল্লেখযোগ্য।

শোলাশিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিল্পটি দুটি মূলধারায় বিভক্ত(। একটি ডাকের সাজ, অন্যটি বিশুদ্ধ শোলার কাজ। ডাকের সাজের প্রাচীনতম রূপ হল সুতোফরসীর কাজ। শোলার পাতের ওপর বিরজা ও মোমের আঠা মাখিয়ে নিয়ে এবং সুতো প্রয়োজনমত মিহি, মাঝারী ও মোটা করে পাকিয়ে নিয়ে ঐ শোলার পাতের উপর নক্সা করে ন(ণ দিয়ে কাটা হ'ত। কাজটিকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঢেকে দেওয়া হ'ত পাতলা রূপালী ও সোনালী তবক দিয়ে। পাতলা তবক দিয়ে ঢাকার ফলে ফুল-নক্সাগুলো ওপর দিয়ে দেখা যেত— গোটাটা সোনালী অথবা রূপালী হয়ে যেত। এই কাজে অভ্র ও তবক ব্যবহার করা হ'ত। পরবর্তীকালে জরি ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানির ফলে সুতোফরসীর কাজ আস্তে আস্তে কমে যায় এবং জরির কাজ শু(হয়। ডাকের সাজ তৈরী হ'ত শোলার পাতের ওপর জরি আংটি (জরি তামা দিয়ে তৈরী এবং নিকেল করা, অতি আকর্ষণীয়), পেটা চুমকি, গোখরী (আংটি দিয়ে মেশিনে বোনা কোচান দেখতে), কিরণ (ঝিলমিলে দেখতে), অভ্র, তবক, মোম বিরজার আঠা প্রভৃতির সাহায্যে নক্সা করে ন(ণ দিয়ে কেটে তৈরী হ'ত এই শিল্প কাজ।

সুতোফরসীর কাজে ও ডাকের সাজের কাজে প্রতাপ মালাকার, শশধর মালাকার,অবিনাশচন্দ্র মালাকার, যোগেশচন্দ্র কর্মকার, কালীপদ সরকার, তারাপদ কর্মকার, রেণুপদ সরকার, কিশোরী মালাকার, জজানের সন্তোষ মালাকার (নাড়ু), জজানের অমরেন্দ্র ঘোষ, সেকেন্দ্রার প্রসন্ন মালাকার, ছাপঘাটির বি(েনাথ মালাকার ও অসম্ভাবিনী মালাকার, ভগবানগোলার ইন্দুভুষণ মালাকার, মনোরমা মালাকার, বহরমপুরের হিরণ্ময় কর্মকার প্রভৃতি শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বিশুদ্ধ ডাকের সাজের কাজ এখন আর নেই। ডাকের সাজের কাজটির বিশুদ্ধতায় ভাঙন ধরে প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমত (চির পরিবর্তন, দ্বিতীয়তঃ ডাকের সাজের কাজে প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা। পরবর্তীকালে ডাকের সাজ বলে যে শিল্পটি প্রচলিত সেটি শোলার পাতের উপর বুলেন, সলমা চুম্‌কি, ডাকপাত প্রভৃতি বসিয়ে আঠা সহযোগে নক্সা করা হয়। কোথাও কোথাও শোলার পাত ছুরি দিয়ে জাফরি কেটে 'সেলোফেন পেপার' বসিয়ে তার পাশে শোলার নক্সা করা হয়। অনেক সময় ঠিকমত মূল্য পাওয়া যায় না বলে শিল্পীরা শোলার পাতের পরিবর্তে কাজের উপর শোলা, বুলেন, সলমা চুম্‌কি ইত্যাদি বসিয়ে কাজ করেন। ডাকের সাজের পর আসে বুলেনের গহনা। তারপর ১৯৬৫ সালে এল শোলার গহনা। মুর্শিদাবাদে এই বিবর্তনের প্রবর্তক হলেন হিরণ্ময় কর্মকার। উপযুক্ত(পারিশ্রমিকের অভাবে এবং (চির পরিবর্তনের ফলে

বর্তমানে ডাকের সাজের রূপান্তর ঘটেছে। অতীতে এই ডাকের সাজই ছিল শিল্পীদের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম এবং শোলার কাজটা ছিল শিল্পীর শিল্পভাবনা প্রকাশের অবলম্বন। আজ থেকে আনুমানিক ২০০ বছর আগে বিশুদ্ধ শোলার কাজ বলতে কদম ফুল, দুলোঙ্গী, একধরনের মালা (বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয়), চাঁদোয়া, পাল্কী ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে শোলা দিয়ে নানা রকম ফুল, কদমগাছ, টিয়া, কাকাতুয়া প্রভৃতি নানাধরণের পাখি, ঝুলন্ত ঘোড়া, পাল্কী, ফুলঘড়া, পদ্মলতা প্রভৃতি তৈরী হ'ত। এর পরবর্তী অধ্যায়ে যজ্ঞে্বের মালাকার কর্তৃক নসীপুর রাজবাড়ীর অনন্যসাধারণ মডেলটি শোলাশিল্পের একটি দিগন্তকে উন্মোচন করে, কিন্তু এই শিল্পটির ধারাবাহিকতার কোন ইতিহাস পাওয়া যায়নি। আনুমানিক ১৯৪১ সালে বণ্যে্বের মালাকারের পুত্র প্রফুল্ল মালাকার শোলায় একটি গান্ধীমূর্তি তৈরী করার জন্য জিয়াগঞ্জের শি(া ও শিল্প প্রদর্শনী থেকে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। আনুমানিক ১৯৪৫ সালে ইন্দুভূষণ মালাকার শোলার পদ্মফুল তৈরী করে তৎকালীন ডি.পি.আই এর সার্টিফিকেট ও মেডেল পান। কথিত আছে যজ্ঞে্বের মালাকার রাজশাহীর নওগা গাঁজা বাড়ীটির শোলার মডেল তৈরী করে সোনার মেডেল পান। প্রফুল্ল মালাকার ১৯৪৭ সালে ইডেনে অনুষ্ঠিত শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীতে একটি শোলার মূর্তি পাঠিয়ে প্রথম পুরস্কার পান।

মুর্শিদাবাদের আধুনিক শোলা শিল্পের (েত্রে হিরণ্ময় কর্মকার এক নতুন ধরনের পথের প্রবর্তক বলা যেতে পারে। এই অনন্য সাধারণ শিল্পী মুর্শিদাবাদের শোলা শিল্পকে যথার্থ শিল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে শোলায় পূর্বে তৈরী হ'ত শুধু প্রতিমার সাজ, টোপর, মুকুট, কদমফুল, পাখি, পাল্কী, সেই শোলায় আজ সৃষ্টি হচ্ছে অনবদ্য সব শিল্পকাজ। বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে র(িত রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তি তার অন্যতম নিদর্শন--শিল্পী হলেন হিরন্ময় কর্মকার। শোলার পূর্ণাবয়ব দুর্গা , সরস্বতী , গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী কৃষ(ার্জুন, বুদ্ধ, যীশু, ইত্যাদির মূর্তি সমূহ তৈরী হচ্ছে। তাদের মুখাবয়ব অনন্য সাধারণ, হাত ও পায়ের আঙ্গুল তৈরীতে শিল্পীদের দ(তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

শোলাশিল্পটি এখন আর শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় শিল্পীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সাধারণ মানুষের জীবনেও শোলা এসেছে শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনে নয়, এসেছে গৃহ সাজাবার উপকরণ হিসাবে, উপহার দ্রব্য হিসাবে। বিভিন্ন ধরনের কার্ড, গোলাপ ফুল, চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়, ব্যাজ, ময়ূরপঙ্খী, আম্বারী হাতি, বজরা, মঞ্চসাজাবার উপকরণ, অ্যালবাম, স্কুলের হস্তশিল্পের খাতার অলংকরণ, বিয়ের গাড়ী সাজান, বিভিন্ন ধরনের টোপর, মুকুট, বিচিত্র ধরনের গহনা শিল্পে পরিণত করেছে। বহরমপুর থেকে যেমন আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ডে শোলার দুর্গামূর্তি পাঠান হয় তেমনি বম্বে থেকেও বহরমপুরের শিল্পী নির্মল ও পরিমল কর্মকারকে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপ্রতিমার অলংকরণ ও সাজ তৈরীর জন্য।

এখন এই শিল্পের কাঁচামাল প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই শিল্পের কাঁচামাল হল শোলা। শোলা একটি জলজ উদ্ভিদ যা বিভিন্ন জলা জমিতে ও পুকুরে নিজ থেকেই জন্মায়। দূর থেকে শোলা দেখতে অনেকটা গোল লাঠির মতো, ব্যাস ৮-১০ সে.মি.। সবুজ রঙের এই জলজ উদ্ভিদের গায়ে তুলোর মত দেখতে নরম লোমের একটা আবরণ থাকে।

এগুলি শুকিয়ে গেলে গাঢ় অথবা হাল্কা খয়েরি রঙে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু এই সবুজ অথবা খয়েরি রঙটি বাইরের খোসা জাত। ভেতরে যে দুধ সাদা অংশটি থাকে সেটি শিল্প সৃষ্টির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মুর্শিদাবাদের যে অঞ্চলগুলি শোলা উৎপাদনের উৎস ছিল, সেগুলির দিকে তাকান যাক। গোকর্ণ থেকে শু(করে অনেক দুর পর্যন্ত বিস্তৃত অমিত্রা বিলে আগে উৎকৃষ্ট মানের শোলা পাওয়া যেত। এখন ওখানে ধান চাষ হয়। ভাগীরথী পার হয়ে জীবন্তী গ্রামে তেলকর বিলে প্রচুর শোলা হ'ত -- এখন ওখানে শোলা হয় না। কর্ণসুবর্ণের কাছে হিজলের বিলে এখনও কিছু শোলা হয়। ভাগীরথী পেরিয়ে জীবন্তী, উগড়া, ভাটপাড়া, অমরকুন্ড, মাধুনিয়া, জিয়াদারা প্রভৃতি গ্রামে কিরীটে্বরীর পুকুরগুলোতে শোলা হয়। এই শোলাগুলির মান উৎকৃষ্ট। রাঢ় অঞ্চলের শোলা উৎকৃষ্ট হলেও বাগড়ী অঞ্চলের শোলার গুণগত মান তেমন উন্নত নয়। আজিমগঞ্জ পেরিয়ে ঘুঘরীডাঙায় জঙ্গীপুর অঞ্চলে মণিগ্রামের অনতিদূরে একটা বিলে কিছু শোলা হয়। এক দশক আগে সালে জেলার শোলাশিল্পীরা স্থানীয় শোলা ব্যবহার করলেও তারা তাদের প্রয়োজনের বেশি অংশটাই সংগ্রহ করতেন হাওড়া হাট থেকে। বর্তমানে এই শোলা হাট হাওড়া থেকে বিধাননগরে সরে এসেছে। বহরমপুরের শিল্পীরা উত্তরবঙ্গ, দিনাজপুর (ডালখোলা, রায়গঞ্জ) এবং বিধাননগরের শোলা বেশি ব্যবহার করেন। বিধাননগরে যে শোলা বিক্রি(হয় তার অধিকাংশ আসে বাংলাদেশ থেকে। সে দেশের কিছু মানুষ সীমান্তের প্রহরীদের অল(্যে সীমান্ত পেরিয়ে এপারে মহাজনদের কাছে নামমাত্র দামে শোলার বোঝা বিক্রী(করে যাচ্ছে।

শোলাশিল্পে শিল্পীর সংখ্যা সবসময়ই কম। শিল্পটি মূলতঃ পারিবারিক শিল্প হিসাবে কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

পাঁচের দশকে ২০/২৫ জন প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন যাঁরা ডাকের সাজ ও টোপর করতে পারতেন। সাধারণ শিল্পীরা ডাকের সাজ করতে পারতেন না। ১৯৫২ সালে ডাকের সাজের মজুরী ছিল ৩০-৪০ টাকা। ১৯৫৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০-৭০ টাকায়। পাঁচের দশকে ১২ টি দুর্গা প্রতিমার সাজের জন্য গড়ে মজুরী ছিল ৩৫ টাকা। রথের দিন থেকে শু(করে পুজার শু(র দিন পর্যন্ত ৮০ দিন কাজ করে শিল্পীরা পেতেন ৫৪০ টাকা। আনুষঙ্গিক খরচ হ'ত প্রায় ২০০ টাকা অর্থাৎ শিল্পীর নিট্ পারিশ্রমিক হ'ত ৩৪০ টাকা। প্রতিমা সাজিয়ে দিলে প্রত্যেক বাড়িতে শিল্পীরা পেতেন দশ সের চাল, এক সের ডাল, দশ সের আলু, একটা ধুতি, এক টিন মুড়ি, দুটো নারকেল, এক সের চিনি সহ পাঁচ টাকা। একটি দুর্গা প্রতিমার সজ্জার জন্য বুলেনের গহনা বাবদ শিল্পী পেতেন ২০ টাকা। এই গহনার মান অনুসারে দামে পার্থক্য ছিল ১৫-২৫ টাকার মধ্যে।

১৯৬৫ সালে ডাকের সাজের মূল্য যেখানে ছিল ২৫০ টাকা, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১০,০০০ টাকা অতিত্র(ম করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর রাজবাড়ির পূজামণ্ডপের জাঁকজমক স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের শিল্প কাজেরও দিন ফুরিয়েছে। বর্তমানে সারা মুর্শিদাবাদে প্রায় ৫০টি পরিবার শোলার কাজে নিযুক্ত(রয়েছেন। অর্থাৎ প্রায় ২৫০/৩০০ জন মানুষের জীবিকার উৎস হলো এই শিল্প। তবে শিল্পীদের দ(তার বিচারে সুস্পষ্ট ভাগ রয়েছে। প্রথমতঃ অর্ধদ(এবং দরিদ্রতম শিল্পী হলেন তাঁরা, যাঁরা দুলুঙ্গী, কদম, মালা, চাঁদমালা তৈরী করেন। দ্বিতীয়তঃ যারা বিয়ের টোপর, ঠাকুরের গয়না, বিভিন্ন ধরনের রাখী তৈরী করেন। এরাও দ(শিল্পী কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। তৃতীয়ত যারা বিশেষ দ(শিল্পী তাঁরা ময়ূরপঙ্খী, হাতি, বিভিন্ন ধরনের কার্ড, নানা ধরনের খেলনা তৈরী করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শোলা দিয়ে বিশেষ ধরনের প্রতিকৃতি তৈরী করতে পারেন মুর্শিদাবাদের মাত্র ৫/৬ জন শিল্পী।

এই শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিকীকরণের কোন সুযোগ নেই। শোলাশিল্প সম্পূর্ণভাবে একটি হস্ত শিল্প। এখানে যন্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত সীমিত। 'ডাকের সাজ' এর জন্য প্রয়োজন হয় (১) শোলাকাটার ছুরি (কাড়), (২) বিভিন্ন সাইজের কাঁচি (চার রকম), (৩) ন(ণ (ছয় রকম), (৪) ছেনী (এক ইঞ্চি চওড়া থেকে .২৫ ইঞ্চি পর্যন্ত ১০/১২ রকমের), (৫) সন্না (চার রকমের), (৬) কাতারি (সাঁড়াশি ধরনের), (৭) হাতুড়ি, (৮) কম্পাস (চার রকমের), (৯) জরির পাত কোচানোর কল, না হলে সন্না দিয়ে জরি কুচিয়ে নিতে হয়। বর্তমানে বিশুদ্ধ শোলার কাজে যে যন্ত্রপাতি লাগে তা হল শোলাকাটা ছুরি (বিভিন্ন সাইজের), কম্পাস, কাঁচি, বাঁশের চিয়ারি (বিভিন্ন সাইজের)। চিয়ারি দিয়ে শোলার মূর্তির চোখ, নাক, মুখ আঁকা হয়, মূর্তির শরীর মসৃণ করার জন্য বিভিন্ন আকৃতির চিয়ারির প্রয়োজন হয়। শিল্পীরা নিজেরাই এটা তৈরী করে নেন। এ সব অতি সহজ, সরল প্রাচীন ধরনের অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরী হয় অনবদ্য সব শিল্পকর্ম।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিমার সাজ তৈরীর ((ত্রে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের মটর দানাকাটা ও বসানো প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত(না করতে পারলে ঐ কাজটি একেবারেই লাভজনক হয় না। শোলা এখন পিস হিসাবে বিত্র(য় হয়। ১৯৯২ সালে প্রতিটি শোলার দাম ছিল ৩-৪ টাকা। ২০০১ সালে দাম হয়েছে ৫-৭ টাকা। বর্তমানে কালীর গয়নার দাম ৪০.০০ টাকা, দুর্গার গয়নার দাম ১৩০.০০ টাকা, এক সাইজ ছোট হলে ১২০.০০ টাকা, বি(কর্মার গয়না ৩৫.০০ টাকা, এই গয়না তৈরী করতে খরচ হবে অন্ততঃ ১৫.০০, ৫০.০০, ৪০.০০, ১৫.০০ টাকা। অর্থাৎ শিল্পীর আয় হবে যথাত্র(মে ২৫.০০ টাকা, ৮০.০০ টাকা, ৮০.০০ টাকা এবং ২০.০০ টাকা।

সাধারণ শোলার মালার দাম ৫ টাকা এবং ভাল মালার দাম ৩০ টাকা। সাধারণ মালা ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৬/৭টি তৈরী করা সম্ভব অর্থাৎ দিনে ৩০-৩৫ টাকার মালা তৈরী সম্ভব, আর থেকে শোলা খরচ বাবদ ১৫-২০ টাকা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ১৫ টাকা মাত্র। ভাল মালা একদিনে দেড় খানা র বেশী তৈরী করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ একদিনে ৪৫ টাকার জিনিস তৈরী সম্ভব(এর থেকে শোলা খরচ ২০.০০ টাকা বাদ দিলে শিল্পীর রোজগার হয় দিনে মাত্র ২৫ টাকা। কদম প্রতি পীস ১.০০ টাকা, দুলুঙ্গী ০.৫০ টাকা। একদিনে ২৫-৩০টি কদম এবং ৫০টি দুলুঙ্গী তৈরী করা সম্ভব। ২৫-৩০ টাকার কদম তৈরী করতে শোলা খরচ হয় ১৫ টাকা অর্থাৎ শিল্পীর রোজগার মাত্র দিনে ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা। টোপরের ((ত্রে সাধারণ টোপর ১০০.০০ টাকা, মাঝারী ১৫০ টাকা, ভাল ৩০০ টাকা, সাধারণ টোপরের খরচ ২৫ টাকা অর্থাৎ শিল্পীর রোজগার ৭৫ টাকা, এই টোপর করতে ২ দিন সময় লাগে, অর্থাৎ টোপরের শিল্পী দিনে মাত্র ৩৭.৫০ টাকা রোজগার করতে সমর্থ। মাঝারী টোপরের দাম ১৫০ টাকা, শোলা খরচ একই, শ্রম দিবস ৩ দিন। এখানে দৈনিক রোজগার ৪১ টাকা মাত্র। ভাল টোপরের ((ত্রে শোলা খরচ ৩০ টাকা এবং শ্রমদিবস ৩.৫ দিন, ৪৮ টাকা রোজগার। খুব ভাল টোপরের

(ে ত্রে শোলা খরচ ৩৫ টাকা এবং শ্রম দিবসের সংখ্যা ৪। সুতরাং খুব ভাল টোপরের (ে ত্রে দৈনিক রোজগার ৬৬ টাকা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভাল টোপরের চাহিদা খুব কম, তাই বিক্রি(ও কম। শিল্পদ্রব্য নির্মাণের আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিলে শিল্পীর হাতে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে ন্যুনতম মজুরী বলা যেতে পারে। যারা কদম বা দুলুঙ্গী তৈরী করেন তাদের প(ে ন্যুনতম জীবন যাত্রার মান বজায় রাখা বেশ কষ্টসাধ্য। তাই মুর্শিদাবাদের অনেক শিল্পী জীবনধারণের তাড়নায় অন্য জীবিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। যারা টোপর তৈরী করেন তারা কোনত্র(মে একটি ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারেন। যে মাসে বিবাহ ইত্যাদি থাকেনা সে মাসগুলিতে এই পরিবারগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটে। একজন শিল্পী ১২ ঘণ্টা কাজ করলে ২০টি রাখী তৈরী করতে পারে। রাখীর দাম গড়ে ৮-১০ টাকা অর্থাৎ দিনে ১৬০-২০০ টাকা মূল্যের রাখী একজন দ(শিল্পী তৈরী করতে পারে এবং তার খরচ হবে ৩৫-৪০ টাকা, অর্থাৎ শিল্পীর আয় হবে দিনে ১৬০-২০০ টাকা। অনুরূপ ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৬টি গ্রিটিংস কার্ড তৈরী করা যায়, প্রতিটি কার্ডের দাম ২০ টাকা হলে মোট দাম ২০০ টাকা, একটি কার্ড বাবদ খরচ ৫.০০ টাকা হলে মোট খরচ ১০০ টাকা অর্থাৎ শিল্পীর আয় ১০০ টাকা। কিন্তু রাখী ইত্যাদি থেকে দৈনিক লাভ উপার্জন করা গেলেও এর চাহিদা শুধু একটা বিশেষ সময়ের জন্য হয়ে থাকে। গ্রিটিংস কার্ড সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

ময়ূরপঙ্খী, হাতি ইত্যাদি যারা তৈরী করতে পারেন, তাঁরা মোটামুটি একটি জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারেন। গণেশ বা অন্যান্য প্রতিকৃতি থেকে আয় আশাব্যাঞ্জক। একটি ১২" আম্বারী হাতির দাম বর্তমানে ১৬০০ টাকা, হাতি নির্মাণের আনুষঙ্গিক খরচ ৩৫০ টাকা অর্থাৎ শিল্পীর আয় ১২৫০ টাকা, একজন শিল্পীর প(ে এরূপ হাতি তৈরীতে দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করলে ৭টি শ্রমদিবস প্রয়োজন। ১৮" ময়ূরপঙ্খী দাম ৮০০ টাকা, আনুষঙ্গিক খরচ ২৮০ টাকা, শিল্পীর আয় ৫২০ টাকা, এর জন্য শিল্পীর দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করলে ৪/৫ দিন সময় লাগবে। যে কোন শোলা শিল্পী চেষ্টা করলে ময়ূরপঙ্খী পর্যন্ত তৈরী করতে পারেন। কিন্তু আম্বারী হাতি তৈরীতে বিশেষ শৈল্পিক দ(তা প্রয়োজন। গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি প্রতিকৃতি তৈরী করতে পারেন মুর্শিদাবাদে মাত্র ৫-৬ জন শিল্পী। দ(শিল্পীদলের (ে ত্রেও আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভ করতে হলে পারিবারিক শ্রম অপরিহার্য। অর্থাৎ শিল্পী পরিবারের সকলে একযোগে কাজ করতে পারলেই একমাত্র শিল্পকাজটি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হয়ে উঠতে পারে।

হস্তিদন্ত শিল্প

নবাবী ঐতিহ্যসম্পন্ন মুর্শিদাবাদের একদা গর্বের শিল্প ছিল হস্তিদন্ত শিল্প। নবাব, আমীর ওমরাহ এবং রাজধানীর অন্যান্য ধনী ও অভিজাত ব্যক্তি(দের পৃষ্ঠপোষকতায় একদা এই শিল্প গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল। জেলার ঐতিহ্যময় রেশম শিল্পের তুলনায় কোন অংশে পিছিয়ে ছিল না এই শিল্পটি। পর্যাপ্ত কাঁচামাল, দ(শিল্পীর প্রাচুর্যে এই শিল্পটি ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে আসা দেশী বিদেশী পর্যটকেরা একদা স্মারক হিসাবে সংগ্রহ করতেন জেলার হস্তিদন্ত শিল্পের নমুনা। বেশ কিছু সংগ্রহশালাতেও সংর(িত হয়ে রয়েছে জেলার এই শিল্পটির অপরূপ নিদর্শন। অধুনা আইনের বেড়াজালে আটকে এই শিল্পটি বন্ধ হয়ে গেছে। বন্যপ্রাণী সংর(ণ আইন অনুযায়ী হাতি সংর(িত বন্যপ্রাণীর মর্যাদা পাওয়ায় এখন হাতির দাঁত সংগ্রহ বা মজুত করা বেআইনী। ফলে এই শিল্পের সঙ্গে সং(-ষ্ট শিল্পীরা পেশাচ্যুত হয়েছেন। কেউ কেউ যুক্ত(হয়েছেন দা(শিল্পের সঙ্গে। জেলার ঐতিহ্যময় হস্তিদন্ত শিল্প তাই এখন শুধু ইতিহাস আর গবেষকদের গবেষণার বস্তু।

বাঁশ ও বেতের কাজ

জেলায় বাঁশ ও বেতের নানা আসবাবপত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হয়। মূলত যাযাবর ও ব্যাধ সম্প্রদায়ের মানুষ বাঁশের কাজ করে থাকেন আর বেতের কাজ করেন চর্মকার সম্প্রদায়ভুক্ত(মানুষ । একসময় বাঁশের কাজ মূলত যাযাবর ও ব্যাধ সম্প্রদায়ের মানুষ করলেও এখন এরা জেলার বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। জেলার রাঢ় অঞ্চলে দুলে বাগদি সম্প্রদায় ভুক্ত(মানুষও সমান দ(তায় এই কাজ করে থাকেন। এরা বাঁশ থেকে কুলো, ডালা , ডাগরা, চালুন, সরপোষ, ফুলের সাজি মাছ ধরার পলুই, বিত্তি বা ভাঁড়, মাছ ধরার ঢোল ইত্যাদি তৈরী করে থাকেন। কঞ্চি থেকে তৈরী হয় ডালা, ডালি, মাছ রাখা খালুই প্রভৃতি । বাঁশের চটা তুলে তাক তৈরী করে তা দিয়ে তৈরী হয় কুলো চালুন, সাজি, সরপোষ ইত্যাদি। বাঁশের কঞ্চি থেকে চটা (গ্রাম্য কথায় তোয়াল) তুলে তৈরী হয় ডালি বা তৃণভোজী প্রাণীর হাত থেকে চারাগাছ বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় ঢোপ। গো(র জাব খাবার জন্য নাদ বসানোর জন্য একই রকম ভাবে বাঁশের বাতা কাজে লাগানো হয়। বাঁশ থেকে খিল তৈরী করে তা দিয়ে তৈরী হয় পলুই, বিত্তি , ঢোল ইত্যাদি । অধুনা নানা ধরণের প্লাস্টিকের জিনিসপত্র বের হয়ে বাঁশের এই সব কাজের কদর অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে।

বেতের কাজ জেলাতে হয়ে থাকলেও তার পরিমাণ খুবই কম। একসময় বেতের বোনা ধামা, হেটো , দাড়িপাল্লার পাল্লা আর সের বা কাঠা ছিল গৃহস্থবাড়ীর অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। ফসল মাপা হত হেটো বা কাঠা দিয়ে। এখন আর সেদিন নাই। এখন এসেছে দাঁড়িপাল্লার যুগ। আগে পুজোর কাজে ব্যবহৃত হ'ত ধামা। ধামাভর্তি খই মুড়কি ছিল পূজোর উপকরণ । এখন ধামার পাট উঠে গিয়েছে। বেতের অস্বাভাবিক দাম মানুষকে বিকল্প ব্যবহারে উৎসাহী করছে। এখন বেতের যা কাজ হচ্ছে তা হ'ল সৌখিন আসবাবপত্র। আর সে কাজের ভার চর্মকারদের হাতে নেই। নিপুন হস্তশিল্পীরা ভার নিয়েছে সে কাজের । তবে বাড়ীতে স্থানাভাব এবং বেতের আসবাবপত্রের অত্যধিক দাম জনপ্রিয় করতে পারছে না বেতের কাজকে। বেতের আসবাবপত্র তাই এখন উচ্চবিত্তের স্ট্যাটাস সিম্বল, তাদের আভিজাত্যের প্রতীক।

মৃৎশিল্প

মৃৎশিল্পের ইতিহাস খুব প্রাচীন। খুব প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসেও মৃৎপাত্রের ব্যবহার ল(্যণীয় । কর্ণসুবর্ণ উৎখননে এবং ফরাক্কায় ফিডার ক্যানেল কাটার সময় মাটির তৈরী নানা ধরণের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছিল। বুঝতে অসুবিধা হয়না জেলাতেও মৃৎশিল্পের ইতিহাস বেশ পুরোনো। কর্ণসুবর্ণ রাজবাড়িডাঙার উৎখননে যে সৌধশ্রেনী আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মঞ্চ, সিঁড়ি , বেষ্টনী, দেওয়াল , প্ল্যাটফর্ম, স্তূপ, ভিত প্রভৃতি দেখা গেছে। সব নিদর্শনই সুরকি দিয়ে দুরমুশ করা ছিল। কাজেই একথা পরিষ্কার যে কর্ণসুবর্ণের সময়েই বা তার বহু আগে থেকেই জেলার মানুষ ইঁট তৈরীর বা মাটির ইঁট পুড়িয়ে টেঁকসই করার কৌশল জানত। কর্ণসুবর্ণ থেকে পাওয়া পোড়ামাটির সীলমোহরও এই মতকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

জেলায় মৃৎশিল্পের সেই প্রাচীন ধারাটি আজও প্রবহমান । এখনও মৃৎশিল্পীরা বংশ পরম্পরায় এই শিল্পের ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছেন। হান্টারের 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল (নবম খন্ড) থেকে জানা যায় যে, ১৮৭২ সালের জনগণনার সময় জেলায় ১৮৮৩ জন মৃৎশিল্পী ছিল। এখন সংখ্যাটি যে বেড়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই ।

জেলার মৃৎশিল্পীদের দুটি পৃথক ধারায় ভাগ করা যায় । একদল মাটির বাসনপত্র , হাড়ি কলসী, কুঁজো ইত্যাদি তৈরী করেন আর অন্যরা প্রতিমাশিল্পী । দুই ধারার সঙ্গেই যুক্ত(মৃৎশিল্পীদের প্রায় সকলেই কুম্ভকার সম্প্রদায় ভুক্ত(। মৃৎশিল্পীরা চাকের সাহায্যে তৈরী করেন জলের গেলাশ বা খুরি, চা খাওয়ার ভাঁড় , গ(ের জাব খাওয়ার নাদা, মুড়িভাজার খোলা, হাঁড়ি, কলসী ,কুঁজো, কুয়োর বা পায়খানার পাট, পূজোর সরা, প্রদীপ, পঞ্চ প্রদীপ , ধূপচি , ঘট, ইত্যাদি। তবে ইদানীংকালে পলিস্টিরিনের কাপের ব্যাপক ব্যবহার শু(হওয়ায় মাটির গেলাস বা চায়ের ভাঁড়ের তেমন চাহিদা নেই। সিমেন্টের নাদা তৈরী হওয়াতে চাহিদা নেই মাটির তৈরী নাদা বা পাটের (পাত) । তবে জেলার বাগড়ী অঞ্চলে প্রচুর খেজুর গাছ ও রাঢ় অঞ্চলে প্রচুর তাল গাছ থাকায় রস লাগানোর কলসীর ভালো চাহিদা আছে । ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাটির দ্রব্যাদির চাহিদাও ভালোই। বিয়ে, পৈতে বা অন্নপ্রাশনের মতো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মাটির পাত্রগুলি চিত্রিত করা হয়। বাড়ীর অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা বা বয়স্ক মহিলারাই এই কাজগুলো করে থাকেন।

প্রধানত বাড়ীর পু(ষেরাই কাঠের চাক ও পেটনের সাহায্যে মাটির জিনিসপত্র তৈরী করেন। এগুলো রোদে শুকানোর পর কাঁচা কয়লা ও কাঠের সাহায্যে ভাটিতে পোড়ানো হয়। কখনো পোড়ানোর আগে এলামাটিতে রাঙিয়ে নেওয়া হয়- তাতে পোড়া মাটির জিনিসের রঙ খোলতাই হয়। পরিবারের সকলেই এই পুরো প্রক্রি(য়াতে হাত লাগান। যেহেতু এরা শুধুমাত্র মাটির তৈরী জিনিসপত্র বানান, সেজন্য এরা শিল্পী হিসাবে কদর পান না । সাধারণ লোক মৃৎশিল্পী বলতে বোঝে প্রতিমা শিল্পীকেই।

প্রতিমাশিল্পীরা মাটির মূর্তি তৈরী করেন। আগে এটি ছিল মরসুমী ব্যবসা। দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, কার্ত্তিক পূজার পর সরস্বতী । তারপর আবার প্রতী(া সেই দুর্গাপূজার জন্য। অন্যসময়ে মৃৎশিল্পীরা মূলত ছাঁচে নানা ধরণের মূর্তি তৈরী করতেন ঝুলন এবং নানা মেলায় বিক্রি(র জন্য। এখন সার্বজনীন শনিপূজো বা মানত কালীর দৌলতে সারা বছরেই মৃৎশিল্পীর হাতে অল্প বিস্তর কাজ থাকে । জেলার প্রতিমা শিল্পীদের অপরূপ কাজের যথেষ্ট কদর আছে। জেলার শিল্পীদের তৈরী করা প্রতিমার বিদেশেও সুনাম আছে। এ জেলার প্রখ্যাত মৃৎশিল্পীদের কয়েকজন হলেন ঋষি মিস্ত্রী, আশু মিস্ত্রী, হরিপদ মিস্ত্রী প্রমুখ। এ জেলার প্রয়াত মৃৎশিল্পী যামিনী পালের তৈরী দুর্গাপ্রতিমা বিদেশের সংগ্রহশালায় সংর(িত আছে । এ জেলার শিল্পীদের তৈরী প্রতিমা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে থাকে। আমেরিকা বা লন্ডনের প্রবাসী হিন্দুরাও কখনো কখনো এ জেলা থেকে মূর্তি নিয়ে যান । এ জেলার শিল্পীরা মাটির মূর্তি তৈরী করে কাঁচের ফ্রেমে সেঁটে অভূতপূর্ব শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছেন । কলকাতার নানা বাজারে দেখতে পাওয়া এসব মূর্তিগুলির অনেকটাই জেলার শিল্পীদের তৈরী। জেলার মৃৎশিল্পীদের তৈরী শিল্পদ্রব্য আজো শিল্পরসিকদের আদরের বস্তু।

জেলার প্রায় সর্বত্রই মৃৎশিল্পীদের কমবেশী বসতি আছে । জেলায়

পালপাড়া বা কুমার পাড়া (কুমোর পাড়া) নামে বেশ কয়েকটি গ্রামের অস্তিত্ব আছে। কাঁঠালিয়া, দোহালিয়া, বোলতুলি, বালিরঘাট, পালপাড়া , মহুলা, মাটিয়ারা, মালিয়ান্দি , ব(টিয়া , রায়পুর প্রভৃতি গ্রামের সহস্রাধিক কুম্ভকার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত(।

মিষ্টান্ন শিল্প

এ জেলার মিষ্টান্ন শিল্পের বেশ স্বকীয়তা রয়েছে । বহরমপুরের ছানাবড়া , ইসলামপুরের স্পঞ্জ রসগোল্লা বা বেলডাঙ্গার মনোহরার সুনাম শুধু জেলার মধ্যেই নয় জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। অন্তত এই তিনটি (ত্রে জেলার হালুইকরেরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি(র পরিচয় দিয়েছেন।

জেলায় ঠিক কতজন এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত(আছেন তার কোন সংখ্যাতত্ব নেই। তবে কোনমতেই সংখ্যাটি ৫০০০ এর কম হবে না। জেলার প্রায় সর্বত্র কমবেশী মিষ্টির দোকান দেখা যায় । আগে গ্রামে মিষ্টির দোকান দেখা যেত না এখন মোটামুটি বর্ধিষু(গ্রামে আর মিষ্টির দোকান বিরল নয়। আগে মিষ্টি তৈরীর কাজ করতেন ময়রারা। ময়রারা নিজেরাই দোকান করে মিষ্টি তৈরী ও বিক্রি(করতেন কিম্বা অন্যের দোকানে মিষ্টি তৈরী করে দিতেন। অধুনা গ্রামাঞ্চলের অনেক দোকানেই মিষ্টি তৈরীর জন্য নির্দিষ্ট কোন কারিগর নেই। দোকানদারেরা নিজেরাই কোনরকমে দু'একটি মিষ্টি তৈরীর কলাকৌশল শিখে কাজ চালাচ্ছেন। তবে ভাল কাজ জানা মিষ্টি তৈরীর কারিগরের কদরই আলাদা। শহরের বড় বড় মিষ্টির দোকানগুলোর মধ্যে ভাল ময়রাকে নিয়ে টানাটানি চলে। এইসব দ(কারিগরেররা গতানুগতিক মিষ্টি তৈরীর পাশাপাশি কখনো কখনো নতুল ধরণের মিষ্টি তৈরী করেন - সেই মিষ্টিই হয়তো দোকানের বিশিষ্টতা এনে দেয়।

জেলায় নানাধরণের মিষ্টি পাওয়া যায়। এসব মিষ্টির উৎপত্তি কবে, আর কেইবা তার উদ্ভাবক এ নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু জানা যায় না। ময়রারা ধরে রেখেছেন সেই সব মিষ্টি তৈরীর কলাকৌশল। বহরমপুরের সবচেয়ে বিখ্যাত মিষ্টান্ন হল ছানাবড়া । বড় বড় সাইজের ছানাবড়া মিষ্টান্ন রসিকদের মন ভরিয়েছে । রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজু থেকে রাজীব গান্ধী-- বহরমপুরে আগত বিখ্যাত ব্যক্তি(দের অনেককেই আপ্যায়িত করা হয়েছে বৃহদাকার ছানাবড়া দিয়ে। তিরিশ কেজি বা একমন ওজনের (বা তারও বেশী ওজনের) সব ছানাবড়া অতিথিদের বিস্মিত করেছে। এইসব ছানাবড়া ভাজার কৃৎকৌশলও কম রোমাঞ্চকর নয়। ৮ - ১০ জন কারিগর খাঁটি ঘিয়ে নিভু নিভু আঁচে দিনদুয়েক ধরে ভাজার পর ঐ ছানাবড়াকে আরো দিন দুয়েক রসে ভেজানো হত। তারপর তা পরিবেশিত হ'ত। এখনও ছানাবড়া পাওয়া যায় তবে বেশিরভাগ (ত্রে তা ঘিয়ে ভাজা নয়, ডালডায় ভাজা, দায়সারা ভাবে কড়া আঁচে উপরটা কালো করে নিলেই তৈরী হয়ে যায় এখনকার ছানাবড়া । তবে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য অর্ডার দিলে এখনও পাওয়া যায় সেই বিখ্যাত ছানাবড়া । ছানাবড়ার বিখ্যাত কারিগরদের মধ্যে পটল ওস্তাদ, গোপে(র সাহা, নিমাই মন্ডল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একসময় খাগড়ার ছানার মুড়কিও জেলার অন্যতম বিখ্যাত মিষ্টান্ন ছিল তবে বর্তমানে এর বিশেষ চল নেই।

জেলার আরেকটি অতিবিখ্যাত মিষ্টান্ন হল ইসলামপুরের স্পঞ্জ রসগোল্লা। এ মিষ্টির বিশেষত্ব হ'ল এই রসগোল্লা স্পঞ্জের মতো পর্যাপ্ত রস শুষে নিতে পারে। এই মিষ্টিকে রস (সেরা) থেকে তুলে নিয়ে চিপে রস বের করে দিয়ে আবার রসে ডোবালে ফের রস শোষণ করে আগের অবস্থায় ফিরে যায় । সেজন্যই এই রসগোল্লার নাম স্পঞ্জ রসগোল্লা । আনাড়ি খাইয়ে এ মিষ্টি খেতে গিয়ে রসে জামাকাপড় নষ্ট করে ফেলতে পারে। এই রসগোল্লার আবিস্কারক ইসলামপুরের ফটিক সরকার। গ(র দুধের তৈরী গরম টাটকা ছানা থেকে তৈরী হয় স্পঞ্জ রসগোল্লা । রস হয় খুব পাতলা । ইসলামপুরের বাইরেও কোথাও কোথাও এখন স্পঞ্জ রসগোল্লা তৈরী হচ্ছে, তবে স্বাদে গন্ধে তা ইসলামপুরের মিষ্টির সঙ্গে তুলনীয় নয়।

বেলডাঙ্গার তথা জেলার বিশিষ্ট মিষ্টান্ন মনোহারা। চাঁছি ও ীর দিয়ে তৈরী এই মিষ্টির উপরে পাতলা একটি চিনির আস্তরণ থাকে। মনোহরা পুরোপুরি গোলাকার নয়, একটি দিক সমতল। এতে পে-টে সাজিয়ে রাখার সুবিধা হয়। ভিতরের গোলকটিতে মশলা দেওয়া থাকে বলে এর একটি বিশিষ্ট স্বাদ ও গন্ধ আছে। এই মিষ্টির উদ্ভাবকের নাম জানা যায় না।

শোনা যায় রসকদম্ব বলে পরিচিত মিষ্টান্নটির উদ্ভব ঔরঙ্গাবাদে। পোস্তদানা দিয়ে ঢাকা এই মিষ্টান্নটিও মিষ্টান্ন রসিকদের প্রিয় মিষ্টি। শোনা যায় লর্ড ক্যানিং ও তাঁর স্ত্রীর লালগোলা আগমন উপল(ে লালগোলার মিষ্টান্নশিল্পীরা তৈরী করেন এক ধরনের মিষ্টান্ন। লেডি ক্যানিং এর নামানুসারে সেই মিষ্টির নাম দেওয়া হয় লেডিকেনি। এখনও জেলায় বহুল প্রচলিত মিষ্টান্ন এই লেডিকেনি।

জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জের জৈন সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে পছন্দ করেন মালাই বরফি আর মালপোয়া। মোষের দুধের ছানা থেকে তৈরী হয় এ সব মিষ্টান্ন। গ্রামাঞ্চলে এবং মেলায় লবঙ্গ লতিকা এবং জিলিপির বিশেষ বিক্রি(আছে। শহরে পাওয়া যায় অমৃতি ।

গ্রামের বা আধা গঞ্জের দোকানে গজা পাওয়া যায়। শহরে গজা বিত্রি(র তেমন প্রচলন নেই। পূজার কাজে বা হরির লুটের জন্য শহর গ্রাম নির্বিশেষে বাতাসা বিত্রি(হয়।

মিষ্টান্ন রসিকদের মতে এখন আর মিষ্টির তেমন স্বাদ নেই। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের মতে বিশুদ্ধ ছানার অভাবই এর কারণ। ছানাতে মেশানো হচ্ছে নানাধরণের ভেজাল। পাউডার দুধ দিয়ে ছানা কাটা হচ্ছে। এর ফলে মিষ্টির গুণমান ত্র(মশই নেমে যাচ্ছে। আগে কান্দী ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে ভালোমানের ছানা বহরমপুরে আসত। এখনও ছানা আসে কিন্তু তার মান তেমন ভাল নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য এই শিল্পটি ত্র(মেই বিকশিত হচ্ছে। গ্রামে গঞ্জে মিষ্টির দোকানের ত্র(মবর্দ্ধমান সংখ্যা সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

বিড়ি শিল্প

মুর্শিদাবাদ জেলায় তেমন কোন ভারী শিল্প নেই। একসময় কাশিমবাজারের মণীন্দ্র ও বিটি মিল ছিল জেলার ভারী শিল্পের একমাত্র নিদর্শন। বর্তমানে এটি (গ্ন শিল্প। এই মিলের শ্রমিকেরা এখন নেমেছেন অস্তিত্ব র(ার লড়াই - এ। এরকম অবস্থাতেই ২০০১সালের জনগণনার প্রাথমিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রধান এবং প্রান্তিক কর্মীর সিংহভাগই নিযুক্ত(আছেন গৃহজাত কুটিরশিল্পে (Household industry) । জেলার প্রধান এবং প্রান্তিক কর্মীর ১৮.৪৮ শতাংশ কৃষক, ২৭.৯৯ শতাংশ কৃষিশ্রমিক ২০.৪২ শতাংশ নিযুক্ত(আছেন গৃহজাত কুটির শিল্পে আর অন্যান্য কাজে নিযুক্ত(আছেন ৩৩.১০ শতাংশ কর্মী।

১৯৯১ সালের জনগণনার তথ্যানুযায়ী জেলার প্রধান এবং প্রান্তিক কর্মীর ১৫.১৭ শতাংশ নিয়োজিত ছিলেন কুটির শিল্পে এবং পশ্চিমবঙ্গে শতাংশের বিচারে জেলার স্থান ছিল এক নম্বরে। ২০০১ সালেও মুর্শিদাবাদ তার স্থান ধরে রেখেছে এবং শতাংশের বিচারে নিয়োজিত কর্মীসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০.৪২।

এই বিপুল সংখ্যক কর্মী কোন শিল্পে নিযুক্ত(আছেন তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এদের সিংহভাগই যে বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত(আছেন এমন সন্দেহ অমূলক নয়। এই সন্দেহ আরো দৃঢ় হয় যখন দেখা যায় যে কুটীর শিল্পে নিযুক্ত(কর্মীর সিংহভাগই মহিলা। মোট মহিলা কর্মীর ৬৪.৬৬ শতাংশ নিযুক্ত(আছেন কুটীর শিল্পে । পু(ষদের (ে ত্রে এই হিসাব মাত্র ৭.২৩ শতাংশ।

জেলার বিড়ি শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়েছে মূলত জঙ্গীপুর মহকুমায়। জেলার অন্যত্র বিড়ি উৎপাদিত হলেও তা মূলত স্থানীয় প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগে। একমাত্র জঙ্গীপুর মহকুমাতেই বিড়ি উৎপাদন হয় সারা দেশের বাজার ল(্য করে । বিড়ি শিল্পের কাঁচামালের কোনটিই জেলায় উৎপাদিত হয়না। শিল্পের জন্য কেন্দুপাতা আসে মূলত উড়িষ্যা থেকে আর তামাক আসে গুজরাট থেকে। সম্ভবত ভৌগোলিক অবস্থান আর সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্যই জঙ্গীপুর মহকুমায় এই শিল্পের বিকাশের কারণ। বিগত শতাব্দীর প্রায় শু(থেকেই এ এলাকায় গঙ্গার ভাঙন তীব্রতর হয়ে ওঠে। কৃষিজমি তলিয়ে যেতে থাকে গঙ্গাগর্ভে । স্বাভাবিক ভাবেই জোতজমির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ কমতে থাক । ভূস্বামী , জমিদারেরাও কৃষিতে বিনিয়োগের পরিবর্তে অন্য কোথাও বিনিয়োগের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। ভাঙনে সর্বস্বান্ত নিঃসম্বল মানুষ বাঁচার রাস্তা খুঁজে পান বিড়ি বাঁধার কাজে। এটি যেহেতু শ্রমনিবিড় কুটির শিল্প এবং বিড়ি বাঁধার কৃৎকৌশলও জটিল নয়, অল্প আয়াসে তা আয়ত্ত করা যায়, সেহেতু বিকল্প জীবিকা হিসাবে বিড়ি বাঁধা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এবং কালত্র(মে এটিই হয়ে দাঁড়ায় জঙ্গীপুর এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা।

জঙ্গীপুরের বিড়ি শিল্পের সূচনা মোটামুটিভাবে বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে। ঔরঙ্গাবাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শি(ক বৃন্দাবন মিশ্রের উৎসাহে খুলনার বিজয় সরকার ঔরঙ্গাবাদে প্রতিষ্ঠা করেন 'বি(ি বিজয় বিড়ি কারখানা'। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি(- উদ্যোগের পাশাপাশি বৃহত্তর বাণিজ্যিক উদ্যোগ সেই প্রথম পা রাখল জেলার শিল্প আঙিনায়। জঙ্গীপুরের সুলভ শ্রমশক্তি(, ভাঙনে বিপর্যস্ত মানুষের বিকল্প জীবিকা গ্রহণের আগ্রহ, সর্বোপরি পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বভারতের বিস্তৃত বাজার, এলাকায় শিল্পের কাঁচামালের অভাব স্বত্ত্বেও এই এলাকায় শিল্পটির বিকাশে সাহায্য করে।

তখন বিড়ি তৈরীর কাঁচামাল আসত কলকাতা থেকে এবং উৎপাদনও খুব বেশী ছিল না । কিন্তু অচিরেই বি(ি বিজয় বিড়ি কারখানার উদ্যোগ ও সাফল্য সারা দেশের নজরে আসে এবং গুজরাটের 'মূলজী শিক্কা' বিড়ি কারখানা ঔরঙ্গাবাদে তাদের উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন করে। মূলজী শিক্কা - র জঙ্গীপুরে আগমন বিড়ি শিল্পের (ে ত্রে এক নতুন জোয়ার আনে। জঙ্গীপুরের বিড়ি শিল্পের বিকাশে এদের অবদান অসামান্য। এরা প্রথমেই জঙ্গীপুর মহকুমার উদ্বৃত্ত বেকার শ্রমশক্তি(কে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রচুর লোককে বিড়ি বাঁধার প্রশি(ণ দিয়ে এটিকে অর্থ উপার্জনের আকর্ষণীয় মাধ্যম করে তোলার চেষ্টা করে । এরাই প্রচলন করে মধ্যবর্তী মুন্সী প্রথার। এর আগে বিড়ি শ্রমিক ও মালিকদের সম্পর্ক ছিল সরাসরি। কিন্তু মধ্যবর্তীতে মুন্সী বা ঠিকাদার নিয়োগ করার ফলে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের আর সরাসরি যোগাযোগ রইল

না। মালিক মুন্সীকে ফেরৎযোগ্য সুদবিহীন জমা টাকার পরিবর্তে তামাক ও কেন্দুপাতা দেয় ও বিনিময়ে তৈরী বিড়ি বুঝে নেয়। মুন্সীরাও একই ভাবে বিড়ি শ্রমিকদের কাঁচামাল সরবরাহ করে তাদের কাছ থেকে উৎপাদন বুঝে নেয়। আর কলকাতা থেকে কাঁচামাল আমদানির পরিবর্তে এরা সরাসরি গুজরাট থেকে তামাক এবং উড়িষ্যার কেন্দু বন থেকে কেন্দুপাতা আনার ব্যবস্থা করে মূলধনী খরচ এক ঝটকায় অনেকটা কমিয়ে দেয়।

ঐ বিশের দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয় মৃণালিনী বিড়ি কারখানা । স্বাধীনতার পর বিড়ি শিল্পের বিস্তীর্ণ বাজার সংকুচিত হয়ে আসে। যে বি(বিজয় কারখানার বিড়ি পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত বাজার দখল করে ছিল তারা তাদের বাজার হারায়। তারা তাদের ব্র্যান্ডের বিড়িকে অন্যত্র নতুন করে জনপ্রিয় করে তুলতে ব্যর্থ হয়।'মূলজী শিক্কা '-ও তাদের জঙ্গীপুরের উৎপাদন কেন্দ্র গুটিয়ে নেয়। সেই শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে আসে মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানী। পূর্বভারতের বিস্তৃত বাজার দখলের পর তারা নজর ঘোরায় উত্তর ভারতে । সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মৃণালিনী বিড়ি কারখানার মালিকেরা দাস বিড়ি কারখানা নামে আরেকটি কারখানাও স্থাপন করেন । পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি ছোট বড় কারখানা গড়ে ওঠে জঙ্গীপুর মহকুমায়। এদের মধ্যে পতাকা শিল্পগোষ্ঠী বাজারের অনেকটাই দখল করে নেয়। এখনও সারা ভারতেই মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার বিড়ির জয়যাত্রা অব্যাহত।

উৎপাদনের প্রকৃতি অনুযায়ী জঙ্গীপুর মহকুমার বিড়ি উৎপাদনের ধরণটা দুরকমের , এক-কারখানা বা চত্বর কেন্দ্রিক , দুই - গৃহকেন্দ্রিক। কারখানা বা চত্বর কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিড়ি শ্রমিকেরা কারখানা সংলগ্ন কোন জায়গায় বা চত্বরে বসে বিড়ি বাঁধেন । মুন্সী তাদের কাঁচামাল যোগান দেয় এবং দিনের শেষে শ্রমিকেরা তাদের উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে মজুরি লাভ করে । যেহেতু এই ধরণের কাজে শ্রমবিভাজনের সুযোগ নেই, সেহেতু এই ভাবে যারা বিড়ি বাঁধেন তাদের উৎপাদন স্বভাবতই কম হয়ে থাকে । মূলত যে সব শ্রমিকের বাড়ীতে সহায়ক হাত নেই সেই সব শ্রমিকেরাই এভাবে বিড়ি বেঁধে থাকেন।

জঙ্গীপুর মহকুমায় গৃহকেন্দ্রিক ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় বিড়ি শ্রমিক মুন্সীর কাছ থেকে বিড়ির পাতা, তামাক ,সুতো ইত্যাদি নিয়ে আসেন ও পরে উৎপাদন বুঝিয়ে দিয়ে উৎপাদনের ভিত্তিতে মজুরী লাভ করেন। গৃহকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় বিড়ি শ্রমিক বাড়ীর মহিলা বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের সহায়তা লাভ করেন বলে বেশী উৎপাদন করতে স(ম হন। শ্রমবিভাজনের ফলে একজন শ্রমিক তার স্বাভাবিক উৎপাদনের দেড়গুণ বা দ্বিগুণ উৎপাদনে সমর্থ হন। আর বাড়ীর অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা বিড়ি বাঁধার কাজে বয়স্কদের সহায়তা করতে করতে একদিন নিজেরাই দ(শ্রমিক হয়ে ওঠে এবং এই ভাবে শ্রমিকের সরবরাহ বজায় থাকে । গৃহকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মুন্সীর কাছ থেকে পাতা মশলা আনার পর বাড়ীর মহিলারা বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরা পাতাগুলিকে বিড়ির আকারে কেটে দেয়। এরপর মূল শ্রমিক পাতাগুলিকে সুতো দিয়ে বেঁধে দেয়। এরপর বিড়ির দুই প্রান্ত মুড়ে দেওয়ার দায়িত্বও বর্তায় বাড়ীর অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্য বা মহিলাদের উপর । এভাবে পরিবারের সকলে হাত লাগানোর ফলে উৎপাদন বাড়ে যার ফলশ্রুতিতে বাড়ে উপার্জন। বিড়ি শিল্পে মজুরী উৎপাদন ভিত্তিক হওয়ায় মুন্সীর তরফে কড়া নজরদারী প্রয়োজন হয়না। শ্রমিকরাই উৎপাদন বাড়িয়ে উপার্জন বাড়ানোর ল(্য দ(তা বৃদ্ধির নিরন্তর প্রয়াস চালায়। অপে(াকৃত কমদ(শ্রমিক বেশি সময় বিড়ি বেঁধে নিজের ঘাটতি পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করে। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী হাজার বিড়ি উপযোগী পাতা কাটতে সময় লাগে ৪-৬ ঘন্টা । শ্রমিকের দ(তা অনুযায়ী এক হাজার বিড়ি বাঁধতে সময় লাগে ৮ - ১০ ঘন্টা। শ্রম বিভাজন হলে ঐ সময়েই আরো অধিক উৎপাদন সম্ভব ।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উৎপাদিত বিড়ির গুণমান বজায় রাখার উদ্দ্যেশ্যে প্রতিটি বিড়িশ্রমিককে প্রতি হাজার বিড়ির জন্য ৫০ - ১০০ টি ছাঁট বিড়ি মুন্সীকে দিতে হয়- যার জন্য সে কোন মজুরি পায়না। বিড়ি অ্যান্ড সিগার ওয়ার্কারস (কনডিশন অব্ এমপ-য়মেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৬৬, অনুযায়ী কোন মালিক শ্রমিকদের কাছ থেকে উৎপাদিত বিড়ির পাঁচ শতাংশের বেশী ছাঁট হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনা এবং এই ছাঁট বিড়ির জন্য মালিক বা ঠিকাদার অর্ধাংশ মজুরী দিতে বাধ্য হলেও বাস্তবে শ্রমিকেরা তা পায়না বললেই চলে। শ্রমশক্তি(অঢেল বলে মালিক বা ঠিকাদার এভাবেই শ্রমিকদের ঠকায় বলে অভিযোগ । দ্বিতীয় অভিযোগ শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি.এফ.) নিয়ে । বিড়ি শ্রমিকেরা বর্তমানে প্রতি হাজার বিড়ির জন্য ৩৮.২০ পয়সা মজুরী পান । সব শ্রমিক অবশ্য এই হারে মজুরী পান না। অনেক (ত্রেই কাজের গুণমাণের দোহাই দিয়ে কম মজুরী দেওয়া হয়। নিয়মানুযায়ী শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরীর ১০ শতাংশ পি.এফ, হিসাবে কেটে রাখা হয়। মুন্সীরা পি.এফের টাকা কেটে রাখলেও তা অনেক সময়েই নির্দিষ্ট জায়গায় জমা পড়েনা বা কম জমা পড়ে । যেহেতু শ্রমিকের দৈনিক উৎপাদন নির্দিষ্ট নয় সেহেতু পি. এফ. কাটার পরিমাণও নির্দিষ্ট থাকে না। শ্রমিকদের অভিযোগ তাদের নির(রতার সুযোগ নিয়ে মুন্সীরা তাদের জমানো পি.এফের টাকা নিয়েও দূর্নীতি করে। ২০০২ সালের ১২ই জুলাই সুতি থানার বৈষ(বনগরে মুন্সী ও শ্রমিকদের মধে পি এফ সংত্র(ান্ত বিষয় নিয়ে

ব্যাপক গন্ডগোল হয় যার জেরে গুলিও চলে। গুলিতে মুজিবর রহমান নামে এক বিড়ি শ্রমিক মারা যান।

মালিক প(র বক্ত(ব্য লেবেল বিহীন বিড়ি তাদের এক অসম প্রতিযোগিতার সামনে দাঁড় করিয়েছে। আইন অনুযায়ী প্রতিদিন দশ হাজার বা তার কম বিড়ি উৎপাদনে স(ম এমন কারখানাগুলির সরকারকে কোন রাজস্ব দিতে হয় না। খাতায় কলমে দশ হাজারের কম বিড়ি উৎপাদন দেখালেও এদের অনেকেই দৈনিক ৬০ - ৭০ হাজার এমনকি এক ল(বিড়িও উৎপাদন করে থাকে বলে অভিযোগ। কর দিতে হয়না বলে এদের বিড়ির উৎপাদন মূল্য কম হয় এবং এরা কম দামে বিড়ি বিত্রি(করতে পারে। অনেক সময় এরা নামী কোম্পানীর লেবেল জাল করেও তাদের উৎপাদিত বিড়ি বাজারে ছাড়ে, ফলে (তিগ্রস্থ হয় বড় কোম্পানীগুলি। জেলার বিড়ি শিল্পের এই সমস্যা এখন খুব প্রকট।

জঙ্গীপুর মহকুমার বিড়ি শিল্প জেলার এক বিশাল সংখ্যক মানুষের অন্ন যোগালেও এই শিল্পটি নানা সামাজিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। ধূমপানে স্বাস্থ্যহানির প্রসঙ্গ বাদ দিলেও সেই সমস্যাগুলি মোটেও এড়িয়ে যাবার নয়। বিড়ি শ্রমিকদের বেশ কিছু পেশাগত রোগ হতে দেখা যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে একজন বিড়ি শ্রমিক তার আঙ্গুলের রেখাগুলো হারায় ফলত তাদের ধারণ (মতাও বিলুপ্ত হয়। এম, মোহন দাস এবং অনিল অচ্যুৎ- এর লেখা থেকেও বিড়ি শ্রমিকদের বিশেষ কতকগুলো রোগের কথা জানা যায়। এদের মধ্যে যক্ষ্মা, (াসকষ্ট ও (াসযন্ত্র সংত্র(ান্ত অন্যান্য রোগ, শিরদাঁড়ায় বাতজনিত ব্যাথা, পেটের যন্ত্রণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই শিল্পে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণের হার খুবই বেশী। যদিও পারিবারিক কুটির শিল্পে নিযুক্ত(বলে এদের শিশুশ্রমিক বলা যায়না তথাপি এই শিল্পে শিশুদের সংখ্যাধিক্য উদ্বেগজনক। ৫-৬ বছরের শিশু বিড়ির দুই প্রান্ত মুড়ে দিচ্ছে এমন দৃশ্য জঙ্গীপুর মহকুমার বিড়ি শিল্পের কেন্দ্রগুলিতে খুবই সুলভ। শিশুদের সহায়তা নিয়ে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহী অভিভাবকেরা (বিড়ি শ্রমিকেরা) শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না। সহায়ক হাত বাড়ানোর ল(্য এই সব শ্রমিকেরা প্রজননেও বিশেষ আগ্রহী। এদের মধ্যে জন্মহারও তাই স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। বিয়ের বাজারে বিড়ি বাঁধতে জানা মেয়ের কদর খুব বেশী। বিড়ি বাঁধতে না জানা মেয়ের অযোগ্যতা বলেই বিবেচিত হয় এই সব এলাকায়। নিতান্ত কিশোরী বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় এই সব মেয়েদের। নির(রতা, বাল্যবিবাহ আর কমবয়েসী মাতৃত্ব তাই এই অঞ্চলের খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

বিড়ি শ্রমিকদের সরকারী কল্যাণ মূলক বেশ কিছু প্রকল্প চালু আছে। শ্রমিকদের পি. এফ. বা তাদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। সামশেরগঞ্জের তারাপুরে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় হাসপাতাল। বিড়ি শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণের জন্যও পাওয়া যায় সরকারী সহায়তা। সব মিলিয়ে শিল্পবিহীন মুর্শিদাবাদে এই একটি শিল্পই এখন আশার আলো। একমাত্র এই শিল্পেই হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থান। তবে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই শিল্পের সামনেও সঙ্কট ঘনিয়ে আসতে পারে। দূরদর্শিতা, প্রয়োজনীয় আগাম উদ্যোগ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগই সেই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বর্তমানে জেলার একমাত্র ভারী শিল্প ফরাক্কায় অবস্থিত এন.টি.পি.সি'র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। স্বাধীনতা লাভের পর পরই দেশ গঠনের ল(্যে দেশে ভারী শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। দেশে মানব সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় এদেশে কখনো সুলভ শ্রমিকদের অভাব হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় কাঁচা মালেরও অভাব ছিল না। ছিল পর্যাপ্ত জলসম্পদও। এত কিছু থাকা সত্বেও শিল্প স্থাপনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান সুলভ বিদ্যুতের অভাব ছিল দেশে ভারী শিল্প স্থাপনের প্রধান অন্তরায়।

সেই প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার ল(কেন্দ্রীয় সরকার দেশের নানা প্রান্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়। সেই উদ্যোগের ফলশ্রুতিই ফরাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৯৭৯ এর মার্চ মাসে প্রকল্পটি সরকারী অনুমোদন পায়। সেই অনুমোদন পাওয়ার পর ঐ বছরের ২রা এপ্রিল ফরাক্কায় চালু হয় সাইট অফিস। বি(ে ব্যাঙ্কের অনুমোদনও পাওয়া যায় ঐ বছরের জুন মাসে। ১৯৮১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৩৭৫ একর বিস্তৃত টাউনশিপ, ১৮২৬ একর বিস্তৃত ছাইগাদা এবং ২১২৯ একর প্-্যান্ট এরিয়া মিলে প্রকল্পটি মোট ৪৩৩০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফরাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিই এন.টি.পি.সি-র নিজস্ব প্রযুক্তি(তে তৈরী দেশের প্রথম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের (মতা বিশিষ্ট এই প্রকল্পটির কাজ দুটি পর্যায়ে শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন (মতা বিশিষ্ট ইউনিট এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন (মতাবিশিষ্ট ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

সেই পরিকল্পনা মোতাবেক প্রথম পর্যায়ের ২০০ মেগাওয়াট

উৎপাদন (মতাবিশিষ্ট প্রথম ইউনিটটি কাজ শু(করে ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউনিটটি চালু হয় যথাত্র(মে ১৯৮৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ও ১৯৮৭ সালের ৬ই আগষ্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ের ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদন (মতা বিশিষ্ট প্রথম ইউনিটটি কাজ শু(করে ১৯৯২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এবং দ্বিতীয় ইউনিটটি উৎপাদন শু(করে ১৯৯৪ সালের ৭ই মার্চ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ইউনিট দুটোই পূর্ব ভারতের প্রথম ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন (মতা বিশিষ্ট ইউনিট।

বর্তমানে এই পাঁচটি ইউনিটই বাণিজ্যিক ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ২০০০-০১ আর্থিক বর্ষে বিদ্যুৎকেন্দ্র টি ৮,২৩২.৬৬ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 'ব্যুরো অব্ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড'-এর আই.এস.ও. ৯০০২ শংসাপত্র লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হলেও এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা পশ্চিমবঙ্গের কোন কয়লা খনি থেকে আসে না। এই কেন্দ্রের কয়লা আসে পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কয়লাখনি থেকে । ইষ্টার্ণ কোলফিল্ডস লিমিটেডের লালমাটিয়া কয়লাখনি থেকে কয়লা আনার জন্য এন.টি.পি.সি'র নিজস্ব এবং স্ব-নিয়ন্ত্রিত ৮৫ কি.মি. দীর্ঘ রেললাইন আছে। মেরী-গো-রাউন্ড রেলওয়ে সিস্টেমে এই পথে লালমাটিয়া থেকে কয়লা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এসে পৌঁছায়।

ফরাক্কায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রথমদিকে পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীডের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ, অবিভক্ত(বিহার, উড়িষ্যা, সিকিম এবং দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে সরবরাহ করা হ'ত। অধুনা এই কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও সরবরাহ করা হচ্ছে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বি(দ্ধে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায়। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। ৯৯.৫ শতাংশ দ(তা সম্পন্ন 'ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটরস্' এবং ১৯০ মিটার ও ২৭৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন দুটি চিমনি রয়েছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। সর্বোপরি রয়েছে প্রায় ২০ ল(গাছের একটি সুর(া বর্ম। এরা পরিবেশ দূষণের বি(দ্ধে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

জলীয় বর্জ্য পরিশোধনের প্ল্যান্ট আরো উন্নততর করার প্রচেষ্টাও চালু আছে। ছাই থেকে অ্যালাম, অ্যাস্বেসটস এবং ইঁট তৈরী হচ্ছে। ২০০০-০১ আর্থিক বর্ষে ২,৮৬,৪৪০ মেট্রিক টন ছাই এইসব কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

উৎপাদন কার্যে এবং নিরাপত্তা (ে ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখানোর জন্য বেশ কিছু গৌরব অর্জন করেছে এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। ১৯৯০, ১৯৯৪ এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির মেরিটোরিয়াস প্রোডাকটিভিটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ফরাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ২০০০ সালের জানুয়ারী মাসে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া কনভেনশন অব্ কোয়ালিটি সার্কেল-এ ১৬টি পদক জেতে ফরাক্কার কোয়ালিটি সার্কেল। ১৯৮৭, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ সেফটি কাউন্সিলের নিরাপত্তা পুরস্কারও পেয়েছে ফরাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। ১৫-১৬ বছরের কর্মজীবনে এতগুলি পুরষ্কার জয় অন্য কেন্দ্রগুলির ঈর্ষার বিষয়।

দায়িত্বশীল রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা হিসাবে ফরাক্কা পার্শ্ববর্তী দুটি গ্রাম আন্দুয়া এবং চণ্ডীপুরকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তুলেছে। গ্রামের স্কুল তৈরী, মেরামতি বা সংস্কার, রাস্তা তৈরী ও তার র(ণাবে(ণ, নিকাশি নালা, বাসস্ট্যাণ্ড, যাত্রী প্রতী(ালয় বা বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ল(্য নলকূপ বসানোর কাজ করছে এন.টি.পি.সি.। নিয়মিত ভাবে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পরী(ার জন্য স্বাস্থ্য পরী(া শিবিরও সংগঠিত করে সংস্থাটি।

অচিরাচরিত শক্তি(ব্যবহারে উৎসাহ দানের জন্য আদর্শ গ্রামগুলিতে সৌরশক্তি(চালিত কুকার বা সৌরশক্তি(চালিত বাতির ব্যবস্থা করেছে এন.টি.পি.সি.। শক্তি(সংর(ণের উদ্দেশ্যে প্ল্যান্ট এরিয়ার পার্কে বসানো হয়েছে সৌরশক্তি(চালিত পাম্প। নিজস্ব রেললাইন সংলগ্ন এলাকার কুমারপুরেও বসানো হয়েছে সৌরশক্তি(চালিত বাতি।

সংস্থার কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য সমস্ত রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত(তিনটি টাউনশিপ - পূবা(ণ, নবা(ণ, এবং শুভা(ণ গড়ে উঠেছে প্ল্যান্ট সংলগ্ন এলাকায়। নগর জীবনের সমস্ত অনুষঙ্গ সেখানে সুলভ। বেকারী জর্জরিত জেলায়, জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার প্রতীক , এন.টি.পি.সি'র এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিই আশার আলো।

শিল্প সম্ভাবনা

জেলার শিল্প চালচিত্রের দিকে তাকালে খুব আশাপ্রদ চিত্র নজরে পড়বে না। একদা রাজা মহারাজা নবাব নাজিমদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব ঐতিহ্যবাহী শিল্প জেলায় বিকশিত হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই আজ অবলুপ্ত বা মৃতপ্রায়। প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার বা আধুনিকীকরণের অভাবে সেগুলির দৈন্যদশা আজ অতীব প্রকট। জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলির অধিকাংশই ছিল ঘরানাভিত্তিক। শিল্পগুলি যেহেতু শ্রমনিবিড় শিল্প নয় এবং বেশীরভাগ

(ে ত্রেই শিল্পীর ব্যক্তি(গত দ(তার উপরে তার শৈল্পিক উৎকর্ষতা নির্ভর করে সেহেতু শিল্পীর উত্তরপু(ষ সেই শিল্পে আগ্রহী না হলে শিল্পটির শৈল্পিক ধারা অবলুপ্ত হয়ে যায় তখন তা হয়ে দাঁড়ায় গবেষকের গবেষণার বস্তু। বেশীরভাগ (ে ত্রেই স্ব স্ব (ে ত্রে দ(শিল্পীরা নিজেদের অপত্য ছাড়া তাঁদের শৈল্পিক কৃৎকৌশল হস্তান্তরিত করতে চান না, ফলে তৈরী হয় সমস্যা। শিল্পের বেহাল দশা থেকে শিল্পীর উত্তরপু(ষেরাও সেই সব শিল্পে আগ্রহী হচ্ছেন না, এভাবেই হারিয়ে গেছে জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পের অনেকগুলিই।

জেলার বিপুল মানবসম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর স্বার্থে জেলায় শ্রমনিবিড় ভারী শিল্পস্থাপন করা জ(রী। এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি দরকার বেসরকারী উদ্যোগ । সুলভ শ্রমিক, পর্যাপ্ত জলসম্পদ ও বিদ্যুত এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় জেলায় ভারী শিল্প স্থাপনের আদর্শ পরিবেশ রয়েছে। দরকার শুধু উদ্যমী উদ্যোগপতি।

জেলায় খাদ্য প্রক্রি(য়াকরণ শিল্প বা পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা অনন্ত। 'কৃষি মিউজিয়াম' নামে পরিচিত এই জেলার মরসুমী সব্জীর বিপুল অপচয় হয় । সঠিক দাম না পাওয়ায় চাষীরা অনেক সময় সব্জী মাঠ থেকে ঘরেই তোলে না। কপির মরসুমে কপি, ঢ্যাঁড়সের মরসুমে ঢ্যাঁড়স, লঙ্কার মরসুমে লঙ্কা, টমেটোর মরসুমে টমেটো, এই তালিকার কোন শেষ নেই। সব্জী মাঠ থেকে তোলার খরচ না পোষানোয় চাষীরা গবাদি পশুদের সব্জী খাওয়ায়। কাঁচা ফল বা সব্জী সংর(ণের জন্য নেই পর্যাপ্ত হিমঘর। হাট সংলগ্ন এলাকায় বা সব্জী চাষের এলাকার পাশাপাশি কোন হিমঘর থাকলে চাষীদের অসহায়তা এত প্রকট হয় না। এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হতে পারে খাদ্য প্রক্রি(য়াকরণ শিল্প। খাদ্য প্রক্রি(য়াকরণ শিল্পের বিকাশ ঘটলে উৎপাদক পাবেন তাঁর উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত(দাম, চাঙ্গা হবে গ্রামীণ অর্থনীতি। চাষীর সমৃদ্ধিতেই আসবে জেলার সমৃদ্ধিও।

নানা ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ এই জেলায় পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভবনা যথেষ্ট। প্রতি বছর ৫.৬ ল(পর্যটক মুর্শিদাবাদ পর্যটনে আসেন। সারণী- ৮.৬ দেখলে এ জেলায় পর্যটক আগমন সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। শীতের মরসুমে এ জেলায় পর্যটকের ঢল নামে। সারা বছরে যত পর্যটক আসেন তার প্রায় শতকরা ৭০ - ৭৫ ভাগ পর্যটকই আসেন অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। একমাত্র বিশাল কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে এই পর্যটক আগমন বিঘ্নিত হয়না। সাম্প্রতিক কালে ২০০০ সালের ভয়ংকর বন্যায় জেলার পর্যটন শিল্পে এসছিল ভাটার টান। হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালার টিকিট বিক্রি(র হিসাব থেকে এ বিষয়টা

সারণী- ৮.৬

বৎসর ভিত্তিক জেলায় আগত পর্যটক সংখ্যা

বৎসর	পর্যটক সংখ্যা
১৯৯০-৯১	৩১০২২৪
১৯৯১-৯২	৪৪৯১৯৯
১১৯২-৯৩	৩৪১১৩৮
১৯৯৩-৯৪	৪০০০৩০
১৯৯৪-৯৫	৩৯৯০৫২
১৯৯৫-৯৬	৪০১৯৬৪

সারণী- ৮.৭

মাস ভিত্তিক জেলায় আগত পর্যটকসংখ্যা

মাস	পর্যটক সংখ্যা	
	১৯৯৯	২০০০
সেপ্টেম্বর	২২,০০০	১৭০৬৫
অক্টোবর	১৯০৮২	১৭০৯৭
নভেম্বর	২১,২৪১	১১,৮০১
ডিসেম্বর	৫২,০৮৪	২২,০০০

পরিষ্কার হবে (সারণী-৮.৭)। বেশীরভাগ পর্যটকই শুধু মাত্র হাজারদুয়ারী সংগ্রহশালা এবং মুর্শিদাবাদ শহর সংলগ্ন কয়েকটি দ্রষ্টব্য দেখেই ফিরে যান। সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে জেলার সমস্ত ঐতিহাসিক গু(ত্ব সম্পন্ন জায়গাগুলিকে দেখানোর কোন 'প্যাকেজ' নেই। আগ্রহী কোন পর্যটক নিজেস্ব উদ্যোগে ওই সব জায়গায় যেতে চাইলেও তার জন্য কোন সহায়তা তিনি পান না। এগুলি সবই পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায় । পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে স্থানীয় অর্থনীতিতে নতুন অর্থের সঞ্চালন ঘটবে। (দ্র চা বিক্রে(তা থেকে, রিক্সাভ্যান চালক বা বৃহৎ হেটেল ব্যবসায়ী সবাই এই শিল্পের সুফল পাবেন। তৈরী হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের (ে ত্র। বেকার সমস্যা জর্জরিত এ জেলায় এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অবস্থানগত অসুবিধার কারনে ' উইক এন্ড' ট্যুরের (ে ত্রে আদর্শ পর্যটনস্থল হতে পারে মুর্শিদাবাদ। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে গ্রামীণ অর্থনীতি যে চাঙ্গা হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।